আধুনিক সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

সূচীপত্র

প্রত্যেক প্রবন্ধের শেষে উহার সাময়িক পত্রে প্রকাশের
কাল মুদ্রিত হইয়াছে

বঙ্কিমচন্দ্র

যে কালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলা-দেশের সম্মুখে আবির্‌ভূত হইলেন তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।

সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে লেখক-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

আবার এখনকার যে নূতন পাঠক ও লেখক-সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্যভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কত রূপে কত ভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু বর্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোরূপ পূর্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্তমান কালের নূতন ভাব-প্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যের যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল

সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি— কোথায় গেল সেই 'বিজয়-বসন্ত', সেই 'গোলেবকাওলি', সেই বালক-ভুলানো কথা— কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'। এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিকপত্র, কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে-একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম; সেই-জন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয়, সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল তদনুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই সে জীবনের বেগ আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনো স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব-আনন্দ নবীন-আশার স্মৃতির সহিত বর্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয় সে রাগিণী চিরদিনের নহে। সেদিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্তব্য, মিশ্রিত দুঃখসুখ, ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবর্তিত বিরহমিলন— তাহার পর হইতে গভীর গম্ভীর ভাবে নানা পথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর সে নহবত বাজিবে না। তথাপি সেই এক দিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্তব্যপথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যেদিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেই দিনের সর্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ-উৎসব আমাদের মনে আছে। সে দিন আর নাই। আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোনোদিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে, কোনোদিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এইরূপ হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা বলিয়া আমরা জানি না। কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন-কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে, রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নবশিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃতপ্রায় বেদ পুরাণ তন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না। রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট্-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলি-মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।

মাতৃভাষার বন্ধ্যদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙালির যে কী মহৎ কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর-কিছুই নাই। তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি-পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলাভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে, সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এইজন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই-সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় -রচিত পূর্বতন এণ্ট্রেন্স-পাঠ্য বাংলা গ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিন ভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য, কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত অনুরাগ, সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সংকুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন ; তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরাজিতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরাজি-সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালির মতো বালির বাঁধ নির্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কী হইতে পারে? সম্পূর্ণ ক্ষমতা সত্ত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা উত্তম ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয় তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত-কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত-কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন, সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্বে সেই অনাদরমলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন, পূর্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার যৌবনসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমত, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকলপ্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে-পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা

করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে বর্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে স্থূলভখ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে, অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম। চতুর্দিক্-ব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর-কিছুই নাই; তাহার নিয়ত-প্রবল ভারাকর্ষণশক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম তাহা এখনকার সাহিত্যব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন, তখন যে আরও কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবলে যে কার্য করিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদ্বর্গের কত ঊর্ধ্বে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে; একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব-অভ্যাস-বশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ড বিধান করিতেন যে, দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরো কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোক যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে, অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনো দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। এক দিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন, আর-এক দিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক-পদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোটো ছোটো দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন, বর্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন।

এইজন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনোদিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব করিতে হয় নাই।

সাহিত্যের মধ্যেও দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী এবং কর্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চা করেন, তাঁহার রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপরি-পাওনা— যেন যথালাভের মতো।

কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যে যেখানে যাহা-কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কী কাব্য, কী বিজ্ঞান, কী ইতিহাস, কী ধর্মতত্ত্ব, যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, অভাব পূর্ণ করিতেন তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন। এখন যাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল। বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনালাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর-কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।

এমন-কি, বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথক্‌করণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসংকোচে করিয়াছেন যে এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

বিশেষত দুই শত্রুর মাঝখান দিয়া তাঁহাকে পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছে। এক দিকে যাঁহারা অবতার মানেন না তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্বারোপে বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ান। অন্য দিকে যাঁহারা শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর এবং লোকাচারের প্রত্যেক প্রথাকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারাও বিচারের লৌহাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রের মধ্য হইতে কাটিয়া-কাটিয়া কুঁদিয়া-কুঁদিয়া মহত্তম মনুষ্যের আদর্শ অনুসারে দেবতা-গঠন-কার্যে বড়ো প্রসন্ন হন নাই। এরূপ অবস্থায় অন্য কেহ হইলে কোনো এক পক্ষকে সর্বতোভাবে আপন দলে পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু সাহিত্যমহারথী বঙ্কিম দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালন করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইয়াছেন— তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন— বাক্‌চাতুরীদ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।

কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকার-বদ্ধ— কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র, কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসংগতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহারা সাহিত্যের প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে; কারণ, ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু। এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূপ ভূরিপরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্যে মুগ্ধ এবং

অভিভূত হইয়া পড়েন, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলায় সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল নহে।

এইরূপ অপরিমিত অসংযত কল্পনার দেশে বঙ্কিমের ন্যায় আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। কৃষ্ণচরিত্রে উদ্দাম ভাবের আবেগে তাঁহার কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসম্বরণপূর্বক যুক্তির সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা লিখেন নাই তাহাতেও তাঁহার অল্প ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই।

বিশেষত বিষয়টি এমন যে, ইহা কোনো সাধারণ বাঙালি লেখকের হস্তে পড়িলে তিনি এই সুযোগে বিস্তর 'হরি-হরি' 'মরি-মরি' 'হায়-হায়' অশ্রুপাত ও প্রবল অঙ্গভঙ্গী করিতেন এবং কল্পনার উচ্ছ্বাস, ভাবের আবেগ এবং হৃদয়াতিশয্য প্রকাশ করিবার এমন অনুকূল অবসর কখনোই ছাড়িতেন না ; সুবিচারিত তর্ক-দ্বারা, সুকঠিন সত্যনির্ণয়ের স্পৃহা-দ্বারা পদে পদে আপন লেখনীকে বাধা দিতেন না ; সর্বজনগম্য সরল পথ ছাড়িয়া দিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি-দ্বারা স্বকপোলকল্পিত একটা নূতন আবিষ্কারকেই সর্বপ্রাধান্য দিয়া তাহাকেই বাক্প্রাচুর্যে এবং কল্পনাকুহকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেন, এবং নিজের বিশ্বাস ও ভাষাকে যথাসাধ্য টানিয়া বুনিয়া আশেপাশে দীর্ঘ করিয়া অধিক পরিমাণ লোককে আপন মতের জালে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

বস্তুত আমাদের শাস্ত্র হইতে ইতিহাস-উদ্ধারের দুরূহ ভার কেবল বঙ্কিম লইতে পারিতেন। এক দিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণে য়ুরোপীয়গণের অক্ষমতা, অন্য দিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সংকোচ— এক দিকে রীতিমত পরিচয়ের অভাব, অন্য দিকে অতিপরিচয়জনিত অভ্যাস ও সংস্কারের অন্ধতা— যথার্থ

ইতিহাসটিকে এই উভয়সংকটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে বল্গার ইঙ্গিতে লেখনীকে বেগ দিতে হইবে সেই বল্গার আকর্ষণে তাহাকে সর্বদা সংযত করিতে হইবে। এই-সকল ক্ষমতাসামঞ্জস্য বঙ্কিমের ছিল। সেইজন্য মৃত্যুর অনতিপূর্বে তিনি যখন প্রাচীন বেদ পুরাণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন তখন বঙ্গসাহিত্যের বড়ো আশার কারণ ছিল, কিন্তু মৃত্যু সে আশা সফল হইতে দিল না, এবং আমাদের ভাগ্যে যাহা অসম্পন্ন রহিয়া গেল তাহা যে কবে সমাধা হইবে কেহই বলিতে পারে না।

বঙ্কিম এই-যে সর্বপ্রকার আতিশয্য এবং অসংগতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতিগত। যে-কেহ তাঁহার রচনা পড়িয়াছেন সকলেই জানেন, বঙ্কিম হাস্যরসে সুরসিক ছিলেন। যে পরিষ্কার যুক্তির আলোকের দ্বারা সমস্ত আতিশয্য ও অসংগতি প্রকাশ হইয়া পড়ে হাস্যরস সেই কিরণেরই একটি রশ্মি। কত দূর পর্যন্ত গেলে একটি ব্যাপার হাস্যজনক হইয়া উঠে তাহা সকলে অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা হাস্যরসরসিক তাঁহাদের অন্তঃকরণে একটি বোধশক্তি আছে যদ্দ্বারা তাঁহারা সকল সময়ে নিজের না হইলেও অপরের কথাবার্তা আচারব্যবহার এবং চরিত্রের মধ্যে সুসংগতির সূক্ষ্ম সীমাটুকু সহজে নির্ণয় করিতে পারেন।

নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্যরসের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদিরসেরই সহিত যেন তাহার কোনো-একটি সর্ব-উপদ্রব-সহ বিশেষ কুটুম্বিতার সম্পর্ক

ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্বপ্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস-বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত। এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক্‌, কখনো সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীরভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথমে দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গ-সাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসংগতি নহে, সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির আবশ্যক। মাঝে মাঝে অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধশক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় বল এবং সৌকুমার্যের একটি সুন্দর সম্মিশ্রণ ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীরপুরুষের মনে যেরূপ একটি সসম্ভ্রম সম্মানের ভাব থাকে তেমনি সুরুচি এবং শীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠ বুদ্ধির একটি ভদ্রোচিত বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্তমান লেখক যেদিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল সেদিন একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়্যুনিয়ন-নামক মিলনসভা বসিয়াছিল। ঠিক কত দিনের কথা ভালো স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকান-পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর-সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর-কাহারও পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম, তিনিই আমাদের বহু দিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে, প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেক-বার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমল হাস্যে অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম দর্শনে সেই-যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগ-মূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া

উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সংকুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন।

বঙ্কিমের সেই সসংকোচ পলায়নদৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনো প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক, ঠিক সুরুচি-শিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে সময়কার অসংযত বাক্‌যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্লীলতা সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ বেদনাবোধ রক্ষা করা যে কী আশ্চর্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোনো কালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্মসংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই

শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের অবসানে নির্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটি কোমল প্রসন্নতা, একটি সর্বদুঃখতাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল— যেন জীবনের মধ্যাহ্নরৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহসুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছেন। আজ আমাদের বিলাপ পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্তি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এই শোকে, এই ভক্তিতে, সেই আদর্শপ্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রস্তরের মূর্তি স্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সর্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গহৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থায়ী করিয়া রাখি। ইংরেজ এবং ইংরেজের আইন চিরস্থায়ী নহে; রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক সমাজনৈতিক মতামত সহস্রবার পরিবর্তিত হইতে পারে; যে-সকল ঘটনা যে-সকল অনুষ্ঠান আজ সর্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলাহলে সমাজের খ্যাতিহীন শব্দহীন কর্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে, কাল তাহার স্মৃতি-মাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে; কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃ-ভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদিগের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চির-সৌন্দর্যের অক্ষয় আকর উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের

মধ্যে যাহা-কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা-কিছু অমর করিবে সেই-সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার, প্রকাশ করিবার এবং সর্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।

রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে— আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা রুচি এবং অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের উত্তরপুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন; তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন— ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ কথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া এই বাংলা-লেখকদিগের গুরু বাংলা-পাঠকদিগের সুহৃদ্ এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিমদিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।

বৈশাখ ১৩০১

বিহারীলাল

বর্তমান নববর্ষের প্রারম্ভেই কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে।

বঙ্গের সারস্বতকুঞ্জে মৃত্যু ব্যাধের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার নিষ্ঠুর শরসন্ধানে অল্প কালের মধ্যে অনেকগুলি কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল।

তন্মধ্যে বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাঁহার সুমধুর সংগীত নির্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক -সমাজের দ্বারবর্তী হইত না।

কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সংগীত-কাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তাহাদের নিকটে আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।

বঙ্গদর্শন প্রকাশ হইবার বহু পূর্বে কিছুকাল ধরিয়া অবোধবন্ধু-নামক একটি মাসিক পত্র বাহির হইত। তখন বর্তমান লেখক বালক-বয়স-প্রযুক্ত নিতান্ত অবোধ ছিল। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্তি-সহকারে যখন বোধোদয় হইল তখন উক্ত কাগজ বন্ধ হইয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে পত্রগুলি কতক বাঁধানো কতক বা খণ্ড আকারে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আলমারির মধ্যে রক্ষিত ছিল। অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থাদি থাকাতে সে আলমারিতে চপলপ্রকৃতি বালকদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল। এক্ষণে নির্ভয়ে স্বীকার করিতে পারি, অবোধবন্ধুর বন্ধুত্ব-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সে নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াছিলাম। এই গোপন দুষ্কর্মের জন্য কোনোরূপ শাস্তি পাওয়া দূরে থাক্, বহুকাল ধরিয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছিলাম তাহা এখনো বিস্মৃত হই নাই।

এখনো মনে আছে, ইস্কুল ফাঁকি দিয়া একটি দক্ষিণদ্বারী ঘরে সুদীর্ঘ নির্জন মধ্যাহ্নে অবোধবন্ধু হইতে পৌল-বর্জিনীর বাংলা অনুবাদ পাঠ করিতে করিতে প্রবল বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তখন কলিকাতার বহির্বর্তী প্রকৃতি আমার নিকট অপরিচিত ছিল— এবং পৌল-বর্জিনীতে সমুদ্রতটের অরণ্যদৃশ্য-বর্ণনা আমার নিকট অনির্বচনীয় সুখস্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইত, এবং সেই তরঙ্গঘাতধ্বনিত বনচ্ছায়াস্নিগ্ধ সমুদ্রবেলায় পৌল-বর্জিনীর মিলন এবং বিচ্ছেদবেদনা হৃদয়ের মধ্যে যেন মূর্ছনা-সহকারে অপূর্ব সংগীতের মতো বাজিয়া উঠিত।

এই ক্ষুদ্র পত্রে যে-সকল গদ্যপ্রবন্ধ বাহির হইত তাহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। তখনকার বাংলা গদ্যে সাধুভাষার অভাব ছিল না, কিন্তু ভাষার চেহারা ফোটে নাই। তখন যাঁহারা মাসিক পত্রে লিখিতেন তাঁহারা গুরু সাজিয়া লিখিতেন— এইজন্য তাঁহারা পাঠকদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন নাই এবং এইজন্যই তাঁহাদের লেখার যেন একটা স্বরূপ ছিল না। যখন অবোধবন্ধু পাঠ করিতাম তখন তাহাকে ইস্কুলের পড়ার অনুবৃত্তি বলিয়া মনে হইত না। বাংলাভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রাণসঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্যালোচনা করিবেন তাঁহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।

সে প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।

ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।

রাত্রির অন্ধকার যখন দূর হইতে থাকে তখন যেমন জগতের মূর্তি রেখায় রেখায় ফুটিয়া ওঠে, সেইরূপ অবোধবন্ধুর গদ্যে এবং পদ্যে যেন প্রতিভার প্রত্যুষকিরণে মূর্তির বিকাশ হইতে লাগিল। পাঠকের কল্পনার নিকটে একটি ভাবের দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল।—

সর্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন।
চারি দিকে ঝালাফালা,
উঃ কী জ্বলন্ত জ্বালা,
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গপতন।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্বে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্ম-নিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে— কিন্তু তাহা বিরল— এবং চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।

বিহারীলাল তখনকার ইংরাজিভাষায়-নব্য-শিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না— তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এইজন্য তাহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।

পাঠকদিগকে এইরূপে বিশ্রব্ধভাবে আপনার নিকট টানিয়া আনিবার ভাব প্রথম অবোধবন্ধুর গদ্যে এবং অবোধবন্ধুর কবি

বিহারীলালের কাব্যে অনুভব করিয়াছিলাম। পৌল-বর্জিনীতে যেমন মানুষের এবং প্রকৃতির নিকট-পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম বিহারীলালের কাব্যেও সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মনে আছে নিম্ন-উদ্‌ধৃত শ্লোকগুলির বর্ণনায় এবং সংগীতে মনশ্চক্ষের সমক্ষে সুন্দর চিত্রপট উদ্‌ঘাটিত হইয়া হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিত।

কভু ভাবি কোনো ঝরনার
উপলে বন্ধুর যার ধার—
প্রচণ্ড প্রপাতধ্বনি
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দিকে হতেছে বিস্তার—
গিয়ে তার তীরতরুতলে
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে
ডুবাইয়ে এ শরীর
শবসম রবো স্থির
কান দিয়ে জলকলকলে।
যে সময় কুরঙ্গিণীগণ
সবিস্ময়ে মেলিয়ে নয়ন
আমার সে দশা দেখে
কাছে এসে চেয়ে থেকে
অশ্রুজল করিবে মোচন—
সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে
তাহাদের গলা জড়াইয়ে
মৃত্যুকালে মিত্র এলে
লোকে যেম্নি চক্ষু মেলে
তেম্নিতর থাকিব চাহিয়ে।

কবি যে মন 'হু হু' করার কথা লিখিয়াছেন তাহা কী প্রকৃতির বলিতে পারি না। কিন্তু এই বর্ণনা পাঠ করিয়া বহির্জগতের জন্য একটি বালক-পাঠকের মন হু হু করিয়া উঠিত। ঝর্নার ধারে জলশিকর-সিক্ত স্নিগ্ধশ্যামল দীর্ঘকোমল ঘনঘাসের মধ্যে দেহ নিমগ্ন করিয়া নিস্তব্ধভাবে জলকলধ্বনি শুনিতে পাওয়া একটি পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় বলিয়া মনে হইত; এবং যদিও জ্ঞানে জানি যে কুরঙ্গিগীগণ কবির দুঃখে অশ্রুপাত করিতে আসে না এবং সাধ্যমতে কবির আলিঙ্গনেও ধরা দিতে চাহে না, তথাপি এই নির্ঝরপার্শ্বে ঘনশষ্পতটে মানবের বাহুপাশবদ্ধ মুগ্ধ কুরঙ্গিণীর দৃশ্য অপরূপ সৌন্দর্যে হৃদয়ে সম্ভববৎ চিত্রিত হইয়া উঠিত।

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নামধাম সকল লুকাই,
চাষীদের মাঝে রয়ে
চাষীদের মতো হয়ে
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।
প্রাতঃকালে মাঠের উপর
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর ঝর্।
চারি দিক মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম;
সুস্থ স্ফূর্ত হবে কলেবর।
বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরি
সাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি
সরল চাষার সনে
প্রমোদপ্রফুল্লমনে
কাটাইব আনন্দে শর্বরী।

বরষার যে ঘোরা নিশায়
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায়—
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায়—
সে নিশায় আমি ক্ষেত্রতীরে
নড়বোড়ে পাতার কুটিরে
স্বচ্ছন্দে রাজার মতো
ভূমে আছি নিদ্রাগত,
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।

কলিকাতার ছেলে পল্লীগ্রামের এই সুখময় চিত্রে যে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়—অসন্তোষ মানবপ্রকৃতির সহজাত। অট্টালিকা অপেক্ষা নড়বোড়ে পাতার কুটিরে যে সুখের অংশ অধিক আছে অট্টালিকাবাসী বালকের মনে এ মায়া কে জন্মাইয়া দিল? আদিম মানবপ্রকৃতি। কবি নহে। কবিকে যিনি ভুলাইয়াছেন সেই মহামায়া। কবিতায় অসন্তোষ-গানের বাহুল্য দেখা যায় বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু দোষ কাহাকে দিব? অসন্তোষ মানুষকে কাজ করাইতেছে, আকাঙ্ক্ষা কবিকে গান গাওয়াইতেছে। সন্তোষ এবং পরিতৃপ্তি যতই প্রার্থনীয় হউক, তাহাতে কার্য এবং কাব্য উভয়েরই ব্যাঘাত করিয়া থাকে। অ যেমন বর্ণমালার আরম্ভ এবং সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত, অসন্তোষ ও অতৃপ্তি সেইরূপ সৃজনের আরম্ভে বর্তমান এবং সমস্ত মানবপ্রকৃতির সহিত নিয়ত সংযুক্ত। এইজন্যই তাহা কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কবিদিগের মানসিক ক্ষিপ্ততা বা পরিপাকশক্তির বিকার -বশত নহে। কৃষক-কবি যখন কবিতা রচনা করে তখন সে মাঠের শোভা, কুটিরের

সুখ বর্ণনা করে না ; নগরের বিস্ময়জনক বৈচিত্র্য তাহার চিত্ত আকর্ষণ করে, তখন সে গাহিয়া ওঠে—

কী কল বানিয়েছে সাহেব কোম্পানি !
কলেতে ধোঁওয়া ওঠে আপনি, সজনি !

কলের বাঁশি যাহারা শুনিতেছে মাঠের 'বাঁশের বাঁশরি' শুনিয়া তাহারা ব্যাকুল হয় এবং যাহারা বাঁশের বাঁশরি বাজাইয়া থাকে কলের বাঁশি শুনিলে তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে। এইজন্য শহরের কবিও সুখের কথা বলে না, মাঠের কবিও আকাঙ্ক্ষার চাঞ্চল্য গানে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে।

সুখ চিরকালই দূরবর্তী, এইজন্য কবি যখন গাহিলেন 'সর্বদাই হু হু করে মন' তখন বালকের অন্তরেও তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল। কবি যখন বলিলেন—

কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ
যাই কোনো এ হেন প্রদেশ
যথায় নগর গ্রাম
নহে মানুষের ধাম,
পড়ে আছে ভগ্ন-অবশেষ।
গর্ব-ভরা অট্টালিকা যায়
এবে সব গড়াগড়ি যায়—
বৃক্ষলতা অগণন
ঘের করে আছে বন,
উপরে বিষাদবায়ু বায়।
প্রবেশিতে যাহার ভিতরে
ক্ষীণ প্রাণী নরে ত্রাসে মরে,
যথায় শ্বাপদদল

করে ঘোর কোলাহল,
ঝিল্লি সব ঝিঁ ঝিঁ রব করে।
তথা তার মাঝে বাস করি
ঘুমাইব দিবা বিভাবরী—
আর কারে করি ভয়,
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়
মানুষ-জন্তুকে যত ডরি।

তখন এই চিত্রে ভয়ের উদয় না হইয়া বাসনার উদ্রেক হইল। যে ছেলে ঘরের বাহিরে একটি দিন যাপন করিতে কাতর হয়, ঝিল্লি-রবাকুল বিষাদবায়ুবীজিত ঘন-অরণ্য-বেষ্টিত ভীষণ ভগ্নাবশেষ কেন যে তাহার নিকটে বিশেষরূপে প্রার্থনীয় বোধ হইল বলা কঠিন। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। এক-জন জগতের সমস্ত নূতন নূতন দেশ ঘটনা এবং অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর-একজন শত সহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর-একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখি, আর-একজন খাঁচার পাখি। এই বনের পাখিটাই বেশি গান গাহিয়া থাকে। কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা, একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধ ভাবে এবং বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সিন্ধবাদ নাবিকের অপরূপ ভ্রমণ এবং রবিন্সন্‌ক্রুসোর নির্জন দ্বীপ-প্রবাস মনের মধ্যে যে এক তৃষাতুর ভাবের উদ্রেক করিয়া দিত, অবোধ-বন্ধুর প্রথম কবিতাটি সেই ভাবকেই সংক্ষেপে সংগীতে ব্যক্ত করিয়াছিল।

যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস বোধ হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন-কেমন করিতে থাকে বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।

কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে
যথা যেন গর্জ্জে একেবারে
প্রলয়ের মেঘসংঘ,
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জিয়া বেলারে—
সম্মুখেতে অসীম অপার
জলরাশি রয়েছে বিস্তার,
উত্তাল তরঙ্গ সব
ফেনপুঞ্জে ধব্‌ধব্‌
গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার—
মহাবেগে বহিছে পবন,
যেন সিন্ধুসঙ্গে করে রণ
উভে উভ-প্রতি ধায়,
শব্দে ব্যোম ফেটে যায়,
পরস্পরে তুমুল তাড়ন—
সেই মহা রণরঙ্গস্থলে
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে বিরলে
(বাতাসের হু হু রবে
কান বেশ ঠাণ্ডা রবে)
দেখিগে শুনিগে সে সকলে।
যে সময়ে পূর্ণ সুধাকর
ভূষিবেন নির্মল অম্বর,

চন্দ্রিকা উজলি বেলা
বেড়াবেন করে খেলা
তরঙ্গের দোলার উপর—
নিবেদিব তাঁহাদের কাছে
মনে মোর যত খেদ আছে।
শুনি না কি মিত্রবরে
দুখের যে অংশী করে
হাঁপ ছেড়ে প্রাণ তার বাঁচে।

এই বর্ণনাগুলি কতবার পাঠ করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই, এবং এই-সকল শ্লোকের মধ্য দিয়া সমুদ্র পর্বত অরণ্যের আহ্বান বালক-পাঠকের অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাময়িক অন্য কবির রচনাতেও প্রকৃতিবর্ণনা আছে, কিন্তু তাহা প্রথাসংগত বর্ণনামাত্র, তাহা কেবল কবির কর্তব্যপালন। তাহার মধ্যে সেই সোনার কাঠি নাই যাহার স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে।

সাময়িক কবিদিগের সহিত বিহারীলালের আর-একটি প্রধান প্রভেদ তাঁহার ভাষা। ভাষার প্রতি আমাদের অনেক কবির কিয়ৎ-পরিমাণে অবহেলা আছে। বিশেষত মিত্রাক্ষর ছন্দের মিলটা তাঁহারা নিতান্ত কায়ক্লেশে রক্ষা করেন। অনেকে কেবলমাত্র শেষ অক্ষরের মিলকে যথেষ্ট জ্ঞান করেন এবং অনেকে 'হয়েছে' 'করেছে' 'ভুলেছে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের মিলকে মিল বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। মিলের দুইটি প্রধান গুণ আছে, এক তাহা কর্ণতৃপ্তিকর আর-এক অভাবিত-পূর্ব। অসম্পূর্ণ মিলে কর্ণের তৃপ্তি হয় না, সেটুকু মিলে স্বরের অনৈক্যটা আরও যেন বেশি করিয়া ধরা পড়ে এবং তাহাতে কবির অক্ষমতা ও ভাষার দ্রারিদ্র্য প্রকাশ পায়। ক্রিয়াপদের মিল যত ইচ্ছা

করা যাইতে পারে— সেরূপ মিলে কর্ণে প্রত্যেকবার নূতন বিস্ময় উৎপাদন করে না, এইজন্য তাহা বিরক্তিজনক ও 'একঘেয়ে' হইয়া ওঠে। বিহারীলালের ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নাই। তাহা প্রবহমান নির্ঝরের মতো সহজ সংগীতে অবিশ্রাম ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক হইয়াছে, ছন্দ অকারণে আপন বাঁধ ভাঙিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে কবির স্বেচ্ছাকৃত; অক্ষমতাজনিত নহে। তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে কোথাও এ কথা মনে হয় না যে, এইখানে কবিকে দায়ে পড়িয়া মিল নষ্ট বা ছন্দ ভঙ্গ করিতে হইয়াছে।

কিন্তু উপরে যে ছন্দের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে 'বঙ্গসুন্দরী'তে সেই ছন্দই প্রধান নহে। প্রথম উপহারটি ব্যতীত 'বঙ্গসুন্দরী'র অন্য সকল কবিতার ছন্দই পর্যায়ক্রমে বারো এবং এগারো অক্ষরে ভাগ করা। যথা—

সুঠামশরীর পেলব লতিকা
আনত সুষমাকুসুমভরে,
চাঁচর চিকুর নীরদমালিকা
লুটায়ে পড়েছে ধরণী-'পরে।

এ ছন্দ নারীবর্ণনার উপযুক্ত বটে— ইহাতে তালে তালে নূপুর ঝংকৃত হইয়া উঠে। কিন্তু এ ছন্দের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে যুক্ত অক্ষরের স্থান নাই পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লেখকের এবং পাঠকের অনেকটা স্বাধীনতা আছে। অক্ষরের মাত্রাগুলিকে কিয়ৎ-পরিমাণে ইচ্ছামত বাড়াইবার কমাইবার অবকাশ আছে। প্রত্যেক অক্ষরকে এক মাত্রার স্বরূপ গণ্য করিয়া একেবারে এক নিশ্বাসে পড়িয়া যাইবার আবশ্যক হয় না। দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

হে সারদে, দাও দেখা।
বাঁচিতে পারি নে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয়।
কী বলেছি অভিমানে
শুনো না শুনো না কানে,
বেদনা দিয়ো না প্রাণে ব্যথার সময়।

ইহার মধ্যে প্রায় যুক্ত অক্ষর নাই। নিম্নলিখিত শ্লোকে অনেকগুলি যুক্তাক্ষর আছে, অথচ উভয় শ্লোকই সুখপাঠ্য এবং শ্রুতিমধুর।

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য সোম,
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে,
সম্মুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।

এই দুটি শ্লোকই কবির রচিত 'সারদামঙ্গল' হইতে উদ্‌ধৃত। এক্ষণে 'বঙ্গসুন্দরী' হইতে দুইটি শ্লোক উদ্‌ধৃত করিয়া তুলনা করা যাক।

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

ইহার সহিত নিম্ন-উদ্‌ধৃত শ্লোকটি একসঙ্গে পাঠ করিলে প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে।

অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়ে তীরে
ধরিয়ে ললিত করুণাতান

বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে
গাহিছে আদরে স্নেহের গান।

'অপ্সরী কিন্নরী' যুক্ত অক্ষর লইয়া এখানে ছন্দোভঙ্গ করিয়াছে। কবিও এই কারণে 'বঙ্গসুন্দরী'তে যথাসাধ্য যুক্ত অক্ষর বর্জন করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু বাংলা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ, ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে, এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সংগীত তরঙ্গিত হইতে থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেইজন্যে তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।

আর্যদর্শনে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'সংগীত যখন প্রথম বাহির হইল তখন ছন্দের প্রভেদ মুহূর্তেই প্রতীয়মান হইল। সারদামঙ্গলের ছন্দ নূতন নহে, তাহা প্রচলিত ত্রিপদী, কিন্তু কবি তাহা সংগীতে সৌন্দর্যে সিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছেন। 'বঙ্গসুন্দরী'র ছন্দোলালিত্য অনুকরণ করা সহজ, সেই মিষ্টতা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার বন্ধন ছেদন করা কঠিন, কিন্তু সারদামঙ্গলের গীতসৌন্দর্য অনুকরণসাধ্য নহে।

সারদামঙ্গল এক অপরূপ কাব্য। প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম তখন তাহার ভাষায় ভাবে এবং সংগীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম, অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না। যেই একটু মনে হয় এইবার বুঝি কাব্যের মর্ম পাইলাম অমনি

তাহা আকার পরিবর্তন করে। সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোনো রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্যস্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।

এইজন্য সারদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা অরসিক লোকের নিকট ভালোরূপে প্রমাণ করা বড়োই কঠিন হইত। যে বলিত 'আমি বুঝিলাম না, আমাকে বুঝাইয়া দাও' তাহার নিকট হার মানিতে হইত।

কবি যাহা দিতেছেন তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য পাঠকের প্রস্তুত হওয়া উচিত ; পাঠক যাহা চান তাহাই কাব্য হইতে আদায় করিবার চেষ্টা করিতে গেলে অধিকাংশ সময়ে নিরাশ হইতে হয়। তাহার ফল হয়, যাহা চাই তাহা পাই না এবং কবি যাহা দিতেছেন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। সারদামঙ্গলে কবি যাহা গাহিতেছেন তাহা কান পাতিয়া শুনিলে একটি স্বর্গীয় সংগীতসুধায় হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু সমালোচনা-শাস্ত্রের আইনের মধ্য হইতে তাহাকে ছাঁকিয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহার অনেক রস বৃথা নষ্ট হইয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে সারদামঙ্গল একটি সমগ্রকাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হয় না। দ্বিতীয়ত, সরস্বতী সম্বন্ধে সাধারণত পাঠকের মনে যেরূপ ধারণা আছে কবির সরস্বতী তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

কবি যে সরস্বতীর বন্দনা করিতেছেন তিনি নানা আকারে নানা ভাবে নানা লোকের নিকট উদিত হন। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এবং দয়া স্নেহ প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন। ইংরাজ কবি শেলি যে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে

সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

Spirit of Beauty, that dost consecrate
With thine own hues all thou dost shine upon
Of human thought or form

যাহাকে বলিয়াছেন—

Thou messenger of sympathies,
That wax and wane in lovers' eyes

সেই দেবীই বিহারীলালের সরস্বতী।

সারদামঙ্গলের আরম্ভের চারি শ্লোকে কবি সেই সারদাদেবীকে মূর্তিমতী করিয়া বন্দনা করিয়াছেন। তৎপরে বাল্মীকির তপোবনে সেই করুণারূপিণী দেবীর কিরূপে আবির্ভাব হইল কবি তাহা বর্ণনা করিতেছেন। পাঠকের নেত্রসম্মুখে দৃশ্যপট যখন উঠিল তখন তপোবনে অন্ধকার রাত্রি।—

নাহি চন্দ্র সূর্য তারা
অনলহিল্লোলধারা
বিচিত্র বিদ্যুতদাম-দ্যুতি ঝলমল।
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল।

এমন সময়ে উষার উদয় হইল।—

হিমাদ্রিশিখর-'পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য তপোবন।
বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে—

তামসী-তরুণ-উষা কুমারীরতন।
কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণ।
হাসিল অম্বরতলে
পারিজাত দলে দলে,
হাসিল মানসসরে কমলকানন।

তপোবনে এক দিকে যেমন তিমির রাত্রি ভেদ করিয়া তরুণ উষার অভ্যুদয় হইল তেমনি অপর দিকে নিষ্ঠুর হিংসাকে বিদীর্ণ করিয়া কিরূপে করুণাময় কাব্যজ্যোতি প্রকাশ পাইল কবি তাহার বর্ণনা করিতেছেন।—

অম্বরে অরুণোদয়,
তলে দুলে দুলে বয়
তমসা তটিনীরানী কুলুকুলুস্বনে
নিরখি লোচনলোভা
পুলিনবিপিনশোভা
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাব-ভোলা মনে।
শাখিশাখে রসসুখে।
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দুজনায়।
হানিল শবরে বাণ,
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ—
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়।
ক্রৌঞ্চী প্রিয়সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে—

অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে।
চক্ষে করি দরশন
জড়িমাজড়িত মন,
করুণহৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায়।
সহসা ললাটভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।
কিরণে কিরণময়
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবিচ্ছবি, ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়
ঋষির ললাটে আজি না জানি কী জ্বলে!
কিরণমণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ময়ী সুরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হয়ে স্থির
মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখপানে চেয়ে।
করে ইন্দ্রধনু-বালা,
গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝল্‌মলে কানন—
কর্ণে কিরণের ফুল,
দোদুল চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন।…

করুণ ক্রন্দনরোল
উত-উত-উতরোল,
চমকি বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে—
হেরিলেন রক্তমাখা
মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্নপাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী ওড়ে ঘিরে ঘিরে।
একবার সে ক্রৌঞ্চীরে
আরবার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী—
কাতরা করুণাভরে
গান্ সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী।
সে শোকসংগীতকথা
শুনে কাঁদে তরুলতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।
নিরখি নন্দিনীচ্ছবি
গদগদ আদিকবি
অন্তরে করুণাসিন্ধু উথলিয়া ধায়।

সারদাদেবীর এই এক করুণামূর্তি। তাহার পর ২১ শ্লোক হইতে আবার একটি কবিতার আরম্ভ হইয়াছে। সে কবিতায় সারদাদেবী ব্রহ্মার মানস-সরোবরে স্বর্ণপদ্মের উপর দাঁড়াইয়াছেন এবং তাঁহার অসংখ্য ছায়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহা সারদাদেবীর বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যমূর্তি।—

ব্রহ্মার মানসসরে
ফুটে ঢল ঢল করে

নীল জলে মনোহর সুবর্ণনলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমাযামিনী।
কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্যরাশি
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে—
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অম্বরে।

এই সারদাদেবীর, এই Spirit of Beautyর নব-অভ্যুদিত করুণা-বালিকামূর্তি এবং সর্বত্রব্যাপ্ত সুন্দরী ষোড়শীমূর্তির বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া কবি গাহিয়া উঠিয়াছেন—

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু'ই ভালো লাগে—
গিরিমালা, কুঞ্জবন,
গৃহ, নাটনিকেতন,
যখন যেখানে যাই যাও আগে আগে।…
যত মনে অভিলাষ'
তত তুমি ভালোবাসো,
তত মনপ্রাণ ভ'রে আমি ভালোবাসি।
ভক্তিভাবে একতানে
মজেছি তোমার ধ্যানে,
কমলার ধনমানে নহি অভিলাষী।

এই মানসীরূপিণী সাধনার ধনকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য কাতরতা প্রকাশ করিয়া কবি প্রথম সর্গ সমাপ্ত করিয়াছেন।

তাহার পর-সর্গ হইতে প্রেমিকের ব্যাকুলতা। কখনো অভিমান কখনো বিরহ, কখনো আনন্দ কখনো বেদনা, কখনো ভৎসনা কখনো স্তব। দেবী কবির প্রণয়িণী-রূপে উদিত হইয়া বিচিত্র সুখদুঃখে শতধারে সংগীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছেন। কবি কখনো তাঁহাকে পাইতেছেন কখনো তাঁহাকে হারাইতেছেন, কখনো তাঁহার অভয়রূপ কখনো তাঁহার সংহারমূর্তি দেখিতেছেন। কখনো তিনি অভিমানিনী, কখনো বিষাদিনী, কখনো আনন্দময়ী।

কবি বিষাদিনীকে বলিতেছেন—

অয়ি. এ কী, কেন কেন,
বিষণ্ণ হইলে হেন!
আনত আননশশী, আনত নয়ন,
অধরে মন্থরে আসি
কপোলে মিলায় হাসি,
থরথর ওষ্ঠাধর, স্ফোরে না বচন!
তেমন অরুণরেখা
কেন কুহেলিকা-ঢাকা,
প্রভাতপ্রতিমা আজি কেন গো মলিন!
বলো বলো চন্দ্রাননে,
কে ব্যথা দিয়েছে মনে,
কে এমন— কে এমন হৃদয়বিহীন!
বুঝিলাম অনুমানে,
করুণাকটাক্ষদানে
চাবে না আমার পানে, কবেও না কথা।

কেন যে করে না হায়
হৃদয় জানিতে চায়,
শরমে কি বাধে বাণী, মরমে বা বাজে ব্যথা!
যদি মর্মব্যথা নয়
কেন অশ্রুধারা বয়,
দেববালা ছলাকলা জানে না কখন—
সরল মধুর প্রাণ
সতত মুখেতে গান,
আপন বীণার তানে আপনি মগন।
অয়ি, হা, সরলা সতী,
সত্যরূপা সরস্বতী,
চির-অনুরক্ত ভক্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি
পদপদ্মাসন-কাছে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে,
কী করিবে, কোথা যাবে, দাও অনুমতি।
স্বরগকুসুমমালা
নরকজ্বলন-জ্বালা
ধরিয়ে প্রফুল্লমুখে মস্তকে সকলি—
তব আজ্ঞা সুমঙ্গল,
যাই যাব রসাতল,
চাই নে এ বরমালা এ অমরাবতী।

কবি অভিমানিনী সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

আজি এ বিষণ্ণ বেশে
কেন দেখা দিলে এসে,
কাঁদিলে কাঁদালে, দেবি, জন্মের মতন!

পূর্ণিমাপ্রমোদ-আলো
নয়নে লেগেছে ভালো,
মাঝেতে উথলে নদী, দু পারে দুজন—
চক্রবাক্ চক্রবাকী দু পারে দুজন।
নয়নে নয়নে মেলা,
মানসে মানসে খেলা,
অধরে প্রেমের হাসি বিষাদে মলিন।
হৃদয়বীণার মাঝে
ললিত রাগিণী বাজে,
মনের মধুর গান মনেই বিলীন।
সেই আমি সেই তুমি,
সেই এ স্বরগভূমি,
সেই-সব কল্পতরু সেই কুঞ্জবন,
সেই প্রেম সেই স্নেহ,
সেই প্রাণ সেই দেহ—
কেন মন্দাকিনীতীরে দু পারে দুজন!

কখনো মুহূর্তের জন্য সংশয় আসিয়া বলে—

তবে কি সকলি ভুল?
নাই কি প্রেমের মূল—
বিচিত্র গগনফুল কল্পনালতার?
মন কেন রসে ভাসে,
প্রাণ কেন ভালোবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার?
শত শত নরনারী
দাঁড়ায়েছে সারি সারি—

নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি !
হেরে হারানিধি পায়,
না হেরিলে প্রাণ যায়—
এমন সরল সত্য কী আছে না জানি !

কখনো বা প্রেমোপভোগের আদর্শচিত্র মানসপটে উদিত হয়—

নন্দননিকুঞ্জবনে
বসি শ্বেতশিলাসনে
খোলা প্রাণে রতি-কাম বিহরে কেমন !
আননে উদার হাসি,
নয়নে অমৃতরাশি,
অপরূপ আলো এক উজলে ভুবন ।...
কী এক ভাবেতে ভোর,
কী যেন নেশার ঘোর,
টলিয়ে ঢলিয়ে পড়ে নয়নে নয়ন—
গলে গলে বাহুলতা,
জড়িমাজড়িত কথা,
সোহাগে সোহাগে রাগে গল গল মন ।
করে কর থরথর,
টলমল কলেবর,
গুরুগুরু দুরুদুরু বুকের ভিতর—
তরুণ অরুণ ঘটা
আননে আরক্ত ছটা,
অধরকমলদল কাঁপে থরথর ।
প্রণয়পবিত্র কাম
সুখস্বর্গ মোক্ষধাম—

আজি কেন হেরি হেন মাতোয়ারা বেশ!
ফুলধনু ফুলছড়ি
দূরে যায় গড়াগড়ি,
রতির খুলিয়ে খোঁপা আলুথালু কেশ!
বিহ্বল পাগল প্রাণে
চেয়ে সতী পতিপানে,
গলিয়ে গড়িয়ে কোথা চলে গেছে মন!
মুগ্ধ মত্ত নেত্র দুটি,
আধ ইন্দীবর ফুটি,
ঢুলুঢুলু ঢুলুঢুলু করিছে কেমন!
আলসে উঠিছে হাই,
ঘুম আছে ঘুম নাই,
কী যেন স্বপনমত চলিয়াছে মনে!
সুখের সাগরে ভাসি
কিবে প্রাণ-খোলা হাসি
কী এক লহরী খেলে নয়নে নয়নে!
উথুলে উথুলে প্রাণ
উঠিছে ললিত তান,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে গান গায় দুইজন।
সুরে সুরে সম রাখি
ডেকে ডেকে ওঠে পাখি,
তালে তালে ঢ'লে ঢ'লে চলে সমীরণ।
কুঞ্জের আড়ালে থেকে
চন্দ্রমা লুকায়ে দেখে,
প্রণয়ীর সুখে সদা সুখী সুধাকর।

সাজিয়ে মুকুলে ফুলে
আহ্লাদেতে হেলে দুলে
চৌদিকে নিকুঞ্জলতা নাচে মনোহর
সে আনন্দে আনন্দিনী
উথলিয়ে মন্দাকিনী
করি করি কলধ্বনি বহে কুতূহলে।

এইরূপ বিষাদ বিরহ সংশয়ের পর কবি হিমালয়শিখরে প্রণয়িনী দেবীর সহিত আনন্দমিলনের চিত্র আঁকিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। আরম্ভ-অংশ ব্যতীত হিমালয়ের বর্ণনা প্রশংসার যোগ্য নহে, সেই বর্ণনা বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশ উদ্‌ধৃত করি—

উদার উদারতর
দাঁড়ায়ে শিখর-'পর
এই-যে হৃদয়রানী ত্রিদিবসুষমা।
এ নিসর্গরঙ্গভূমি,
মনোরমা নটী তুমি,
শোভার সাগরে এক শোভা নিরুপমা।
আননে বচন নাই,
নয়নে পলক নাই,
কান নাই মন নাই আমার কথায়—
মুখখানি হাস-হাস,
আলুথালু বেশবাস,
আলুথালু কেশপাশ বাতাসে লুটায়।
না জানি কী অভিনব
খুলিয়ে গিয়েছে ভব
আজি ও বিহ্বল মত্ত প্রফুল্ল নয়নে!

আদরিণী, পাগলিনী,
এ নহে শশিযামিনী—
ঘুমাইয়ে একাকিনী কী দেখ স্বপনে !
আহা কী ফুটিল হাসি !
বড়ো আমি ভালোবাসি
ওই হাসিমুখখানি প্রেয়সী তোমার—
বিষাদের আবরণে
বিমুক্ত ও চন্দ্রাননে
দেখিবার আশা আর ছিল না আমার।
দরিদ্র ইন্দ্রত্বলাভে
কতটুকু সুখ পাবে,
আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার।...
এসো বোন, এসো ভাই,
হেসে খেলে চ'লে যাই,
আনন্দে আনন্দ করি আনন্দকাননে।
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে।
হে প্রশান্ত গিরিভূমি,
জীবন জুড়ালে তুমি
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে।
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে।
প্রিয়ে সঞ্জীবনীলতা,
কত যে পেয়েছি ব্যথা
হেরে সে বিষাদময়ী মুরতি তোমার।
হেরে কত দুঃস্বপন
পাগল হয়েছে মন—

কতই কেঁদেছি আমি ক'রে হাহাকার।
আজি সে সকলি মম
মায়ার লহরী-সম
আনন্দসাগরমাঝে খেলিয়া বেড়ায়।
দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী,
ত্রিভুবন আলো করি,
দু নয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়।
দেখিয়ে মেটে না সাধ,
কী জানি কী আছে স্বাদ,
কী জানি কী মাখা আছে ও শুভ-আননে!
কী এক বিমল ভাতি
প্রভাত করেছে রাতি,
হাসিছে অমরাবতী নয়নকিরণে।
এমন সাধের ধনে
প্রতিবাদী জনে জনে—
দয়া মায়া নাই মনে, কেমন কঠোর।
আদরে গেঁথেছে বালা
হৃদয়কুসুমমালা,
কৃপাণে কাটিবে কে রে সেই ফুলডোর!
পুন কেন অশ্রুজল
বহ তুমি অবিরল,
চরণকমল আহা ধুয়াও দেবীর!
মানসসরসী-কোলে
সোনার নলিনী দোলে,
আনিয়ে পরাও গলে সমীর সুধীর।

বিহঙ্গম, খুলে প্রাণ
ধরো রে পঞ্চম তান,
সারদামঙ্গলগান গাও কুতূহলে।

কবি যে সূত্রে সারদামঙ্গলের এই কবিতাগুলি গাঁথিয়াছেন তাহা ঠিক ধরিতে পারিয়াছি কি না জানি না— মধ্যে মধ্যে সূত্র হারাইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বাস উন্মত্ততায় পরিণত হয়— কিন্তু এ কথা বলিতে পারি, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই। এমন নির্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। বর্তমান সমালোচক এক কালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্যশিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কত দূর কৃতকার্য হইয়াছে বলা যায় না ; কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্যসৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ, ছন্দে এবং ভাষায় সর্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক। এই প্রসঙ্গে আমার সেই কাব্যগুরুর নিকট আর-একটি ঋণ স্বীকার করিয়া লই। বাল্যকালে বাল্মীকিপ্রতিভা-নামক একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়া 'বিদ্বজ্জনসমাগম'-নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটকটি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন-কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।

আজ কুড়ি বৎসর হইল সারদামঙ্গল আর্যদর্শন-পত্রে এবং ষোলো বৎসর হইল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ; ভারতী-পত্রিকায় কেবল একটিমাত্র সমালোচক ইহাকে সাদর সম্ভাষণ করেন। তাহার পর হইতে সারদামঙ্গল এই ষোড়শ বৎসর অনাদৃতভাবে প্রথম সংস্করণের মধ্যেই অজ্ঞাতবাস যাপন করিতেছে। কবিও সেই অবধি আর বাহিরে

দর্শন দেন নাই। যিনি জীবনরঙ্গভূমির নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দর্শক-মণ্ডলীর স্তুতিধ্বনির অতীত ছিলেন তিনি আজ মৃত্যুর যবনিকান্তরালে অপসৃত হইয়া সাধারণের বিদায়সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলেন না; কিন্তু এ কথা সাহসপূর্বক বলিতে পারি, সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্থ শতসহস্র রচনা যখন বিনষ্ট এবং বিস্মৃত হইয়া যাইবে সারদামঙ্গল তখন লোক-স্মৃতিতে প্রত্যহ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে এবং কবি বিহারীলাল যশঃস্বর্গে অম্লান বরমাল্য ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।

আষাঢ় ১৩০১

সঞ্জীবচন্দ্র

পালামৌ

কোনো কোনো ক্ষমতাশালী লেখকের প্রতিভায় কী-একটি গ্রহদোষে অসম্পূর্ণতার অভিশাপ থাকিয়া যায়; তাঁহারা অনেক লিখিলেও মনে হয় তাঁহাদের সব লেখা শেষ হয় নাই। তাঁহাদের প্রতিভাকে আমরা সুসংলগ্ন আকারবদ্ধভাবে পাই না; বুঝিতে পারি তাহার মধ্যে বৃহত্ত্বের মহত্ত্বের অনেক উপাদান ছিল, কেবল সেই সংযোজনা ছিল না যাহার প্রভাবে সে আপনাকে সর্বসাধারণের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে প্রকাশ ও প্রমাণ করিতে পারে।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা পূর্বোক্ত শ্রেণীর। তাঁহার রচনা হইতে অনুভব করা যায় তাঁহার প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু সেই প্রতিভাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার হাতের কাজ দেখিলে মনে হয়, তিনি যতটা কাজে দেখাইয়াছেন তাঁহার সাধ্য তদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহার মধ্যে যে পরিমাণে ক্ষমতা ছিল সে পরিমাণে উদ্যম ছিল না।

তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না। ভালো গৃহিণীপনায় স্বল্পকেও যথেষ্ট করিয়া তুলিতে পারে; যতটুকু আছে তাহার যথাযোগ্য বিধান করিতে পারিলে তাহার দ্বারা প্রচুর ফল পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু অনেক থাকিলেও উপযুক্ত গৃহিণীপনার অভাবে সে ঐশ্বর্য ব্যর্থ হইয়া যায়; সে স্থলে অনেক জিনিস ফেলাছড়া যায়, অথচ অল্প জিনিসই কাজে আসে। তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই; তাহার কারণ, সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী, কিন্তু গৃহিণী নহে।

একটা উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ আমার কথাটা বুঝিতে পারিবেন। 'জাল প্রতাপচাঁদ' -নামক গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র যে ঘটনাসংস্থান প্রমাণ-বিচার এবং লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করিয়া যে একটি কৌতুহলজনক আনুপূর্বিক গল্পের ধারা কাটিয়া আনিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারও সন্দেহ থাকে না— কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে হয়, ইহা ক্ষমতার অপব্যয় মাত্র। এই ক্ষমতা যদি তিনি কোনো প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেন তবে তাহা আমাদের ক্ষণিক কৌতূহল চরিতার্থ না করিয়া স্থায়ী আনন্দের বিষয় হইত। যে কারুকার্য প্রস্তরের উপর খোদিত করা উচিত তাহা বালুকার উপরে অঙ্কিত করিলে কেবল আক্ষেপের উদয় হয়।

'পালামৌ' সঞ্জীবের রচিত একটি রমণীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত। ইহাতে সৌন্দর্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু পড়িতে পড়িতে প্রতি পদে মনে হয় লেখক যথোচিত যত্ন-সহকারে লেখেন নাই। ইহার রচনার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে আলস্য ও অবহেলা জড়িত আছে, এবং তাহা রচয়িতারও অগোচর ছিল না। বঙ্কিমবাবুর রচনায় যেখানেই দুর্বলতার লক্ষণ আছে সেইখানেই তিনি পাঠকগণকে চোখ রাঙাইয়া দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সঞ্জীববাবু অনুরূপ স্থলে অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেটা কেবল পাঠকদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য ; তাহার মধ্যে অনুতাপ নাই এবং ভবিষ্যতে যে সতর্ক হইবেন কথার ভাবে তাহাও মনে হয় না। তিনি যেন পাঠকদিগকে বলিয়া রাখিয়াছেন, 'দেখো বাপু, আমি আপন ইচ্ছায় যাহা দিতেছি তাহাই গ্রহণ করো, বেশি মাত্রায় কিছু প্রত্যাশা করিয়ো না।'

পালামৌ-ভ্রমণবৃত্তান্ত তিনি যে ছাঁদে লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে আশপাশের নানা কথা আসিতে পারে, কিন্তু তবু তাহার

মধ্যেও নির্বাচন এবং পরিমাণসামঞ্জস্যের আবশ্যকতা আছে। যে-সকল কথা আসিবে তাহারা আপনি আসিয়া পড়িবে, অথচ কথার স্রোতকে বাধা দিবে না। ঝর্না যখন চলে তখন যে পাথরগুলাকে স্রোতের মুখে ঠেলিয়া লইতে পারে তাহাকেই বহন করিয়া লয়, যাহাকে অবাধে লঙ্ঘন করিতে পারে তাহাকে নিমগ্ন করিয়া চলে, আর যে পাথরটা বহন বা লঙ্ঘন -যোগ্য নহে তাহাকে অনায়াসে পাশ কাটাইয়া যায়। সঞ্জীববাবুর এই ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে এমন অনেক বক্তৃতা আসিয়া পড়িয়াছে যাহা পাশ কাটাইবার যোগ্য, যাহাতে রসের ব্যাঘাত করিয়াছে এবং লেখকও অবশেষে বলিয়াছেন 'এখন এ-সকল কচ্‌কচি যাক'; কিন্তু এই-সকল কচকচিগুলিকে সযত্নে বর্জন করিবার উপযোগী সতর্ক উদ্যম তাঁহার স্বভাবতই ছিল না। যে কথা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে অনাবশ্যক হইলেও সে কথা সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে।

যেজন্য সঞ্জীবের প্রতিভা সাধারণের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই আমরা উপরে তাহার কারণ ও উদাহরণ দেখাইতেছিলাম, আবার যেজন্য সঞ্জীবের প্রতিভা ভাবুকের নিকট সমাদরের যোগ্য তাহার কারণও যথেষ্ট আছে।

পালামৌ-ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে-একটি অকৃত্রিম সজীব অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাংলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না। সাধারণত আমাদের জাতির মধ্যে একটি বিজ্ঞবার্ধক্যের লক্ষণ আছে; আমাদের চক্ষে সমস্ত জগৎ যেন জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সৌন্দর্যের মায়া-আবরণ যেন বিস্রস্ত হইয়াছে, এবং বিশ্বসংসারের অনাদি প্রাচীনতা পৃথিবীর মধ্যে কেবল আমাদের নিকটই ধরা পড়িয়াছে। সেইজন্য অশনবসন ছন্দভাষা আচারব্যবহার বাসস্থান সর্বত্রই সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের এমন সুগভীর অবহেলা। কিন্তু সঞ্জীবের অন্তরে সেই জরার রাজত্ব ছিল না। তিনি

যেন একটি নূতনসৃষ্ট জগতের মধ্যে এক জোড়া নূতন চক্ষু লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। 'পালামৌ'তে সঞ্জীবচন্দ্র যে বিশেষ কোনো কৌতূহলজনক নূতন কিছু দেখিয়াছেন অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু সর্বত্রই ভালোবাসিবার ও ভালো লাগিবার একটা ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। পালামৌ দেশটা সুসংলগ্ন সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান চিত্রের মতো প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যে সহৃদয়তা ও রসবোধ থাকিলে জগতে সর্বত্রই অক্ষয় সৌন্দর্যের সুধাভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় সেই দুর্লভ জিনিসটি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার হৃদয়ের সেই অনুরাগপূর্ণ মমত্ববৃত্তির কল্যাণকিরণ যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছে— কৃষ্ণবর্ণ কোল-রমণীই হউক, বনসমাকীর্ণ পর্বতভূমিই হউক, জড় হউক, চেতন হউক, ছোটো হউক, বড়ো হউক— সকলকেই একটি সুকোমল সৌন্দর্য এবং গৌরব অর্পণ করিয়াছে।

লেখক যখন যাত্রা আরম্ভ-কালে গাড়ি করিয়া বরাকর নদী পার হইতেছেন এমন সময় কুলিদের বালকবালিকারা তাঁহার গাড়ি ঘিরিয়া 'সাহেব একটি পয়সা' 'সাহেব একটি পয়সা' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; লেখক বলিতেছেন, 'এই সময় একটি দুই-বৎসর-বয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল; অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল।'

সামান্য শিশুর এই শিশুত্বটুকু, তাহার উদ্দেশ্যবোধহীন অনুকরণবৃত্তির এই ক্ষুদ্র উদাহরণটুকুর উপর সঞ্জীবের যে একটি সকৌতুক স্নেহহাস্য নিপতিত রহিয়াছে সেইটি পাঠকের নিকট রমণীয়; সেই একটি উল্টা-হাত-পাতা ঊর্ধ্বমুখ অজ্ঞান লোভহীন শিশুভিক্ষুকের চিত্রটি সমস্ত

শিশুজাতির প্রতি আমাদের মনের একটি মধুর রস আকর্ষণ করিয়া আনে।

দৃশ্যটি নূতন এবং অসামান্য বলিয়া নহে, পরন্তু পুরাতন এবং সামান্য বলিয়াই আমাদের হৃদয়কে এরূপ বিচলিত করে। শিশুদের মধ্যে আমরা মাঝে মাঝে ইহারই অনুরূপ অনেক ঘটনা দেখিয়া আসিয়াছি, সেইগুলি বিস্মৃতভাবে আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। সঞ্জীবের রচিত চিত্রটি আমাদের সম্মুখে খাড়া হইবামাত্র সেই-সকল অপরিস্ফুট স্মৃতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং তৎসহকারে শিশুদের প্রতি আমাদের স্নেহরাশি ঘনীভূত হইয়া আনন্দরসে পরিণত হইল।

চন্দ্রনাথবাবু বলেন, সচরাচর লোকে যাহা দেখে না সঞ্জীববাবু তাহাই দেখিতেন— ইহা তাঁহার একটি বিশেষত্ব। আমরা বলি, সঞ্জীববাবুর সেই বিশেষত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে সে বিশেষত্বের কোনো আবশ্যকতা নাই। আমরা পূর্বে যে ঘটনাটি উদ্‌ধৃত করিয়াছি তাহা নূতন লক্ষগোচর বিষয় নহে, তাহার মধ্যে কোনো নূতন চিন্তা বা পর্যবেক্ষণ করিবার কোনো নূতন প্রণালী নাই, কিন্তু তথাপি উহা প্রকৃত সাহিত্যের অঙ্গ। গ্রন্থ হইতে আর-এক অংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি। লেখক বলিতেছেন, 'একদিন পাহাড়ের মূলদেশে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে একটা পোষা কুকুরকে ডাকিবামাত্র পশ্চাতে সেই চীৎকার আশ্চর্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্বমত হ্রস্বদীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চীৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চনীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম শব্দ কোনো-একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়; সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে শব্দও সেইখানে উঠিতে নামিতে থাকে।… ঠিক যেন সেই স্তরটি শব্দ-কন্‌ডক্টর।'

ইহা বিজ্ঞান, এবং সম্ভবত ভ্রান্ত বিজ্ঞান। ইহা নূতন হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে কোনো রসের অবতারণা করে না— আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে-একটি সাহিত্য-কন্‌ডক্‌টর আছে সে স্তরে ইহা প্রতিধ্বনিত হয় না। ইহার পূর্বোদ্‌ধৃত ঘটনাটি অবিসম্বাদিত ও পুরাতন, কিন্তু তাহার বর্ণনা আমাদের হৃদয়ের সাহিত্যস্তরে কম্পিত হইতে থাকে।

চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার মতের সপক্ষে একটি উদাহরণ প্রয়োগ করিয়াছেন। সেটি আমরা মূল গ্রন্থ হইতে আদ্যোপান্ত উদ্‌ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।—

'নিত্য অপরাহ্নে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম; কেন তাহা কখনো ভাবিতাম না। পাহাড়ে কিছুই নূতন নাই; কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না; কোনো গল্প হইবে না; তথাপি কেন আমার সেখানে যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি এ বেগ আমার একার নহে। যে সময় উঠানে ছায়া পড়ে নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে— জল আনিতে যাইবে। জলে জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে। জলে যে যাইতে পারিল না সে অভাগিনী, সে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রঙ ফিরিতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না— তাহার কত দুঃখ। বোধ হয় আমিও পৃথিবীর রঙ-ফেরা দেখিতে যাইতাম—'

চন্দ্রনাথবাবু বলেন, 'জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যায়, আমাদের মেয়েদের জল আনা এমন করিয়া কয় জন লক্ষ্য করে?' আমাদের বিবেচনায় সমালোচকের এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবে, হয়তো

নাও দেখিতে পারে। কুলবধূরা জল ফেলিয়াও জল আনিতে যায় সাধারণের স্থূলদৃষ্টির অগোচর এই নবাবিষ্কৃত তথ্যটির জন্য আমরা উপরি-উদ্‌ধৃত বর্ণনাটির প্রশংসা করি না। বাংলাদেশে অপরাহ্নে মেয়েদের জল আনিতে যাওয়া -নামক সর্বসাধারণের সুগোচর একটি অত্যন্ত পুরাতন ব্যাপারকে সঞ্জীব নিজের কল্পনার সৌন্দর্যকিরণ-দ্বারা মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়া উক্ত বর্ণনা আমাদের নিকট আদরের সামগ্রী। যাহা সুগোচর তাহা সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আমাদের পরম লাভ। সম্ভবত, সত্যের হিসাব হইতে দেখিতে গেলে, অনেক মেয়ে ঘাটে সখী-মণ্ডলীর নিকট গল্প শুনিতে বা কুৎসা রটনা করিতে যায়, হয়তো সমস্ত দিন গৃহকার্যের পর ঘরের বাহিরে জল আনিতে যাওয়াতে তাহারা একটা পরিবর্তন অনুভব করিয়া সুখ পায়, অনেকেই হয়তো নিতান্তই কেবল একটা অভ্যাসপালন করিবার জন্য ব্যগ্র হয় মাত্র, কিন্তু সেই-সকল মনস্তত্ত্বের মীমাংসাকে আমরা এ স্থলে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি। অপরাহ্নে জল আনিতে যাইবার যতগুলি কারণ সম্ভব হইতে পারে তন্মধ্যে সব চেয়ে যেটি সুন্দর সঞ্জীব সেইটি আরোপ করিবামাত্র অপরাহ্নের ছায়ালোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া কুলবধূর জল আনার দৃশ্যটি বড়োই মনোহর হইয়া উঠে। এবং যে মেয়েটি জল আনিতে যাইতে পারিল না বলিয়া একা বসিয়া শূন্য মনে দেখিতে থাকে উঠানের ছায়া দীর্ঘতর এবং আকাশের ছায়া নিবিড়তর হইয়া আসিতেছে, তাহার বিষণ্ণ মুখের উপর সায়াহ্নের ম্লান স্বর্ণচ্ছায়া পতিত হইয়া গৃহপ্রাঙ্গণতলে একটি অপরূপ সুন্দর মূর্তির সৃষ্টি করিয়া তোলে। এই মেয়েটিকে যে সঞ্জীব লক্ষ্য করিয়াছেন এবং আমরা লক্ষ্য করি নাই তাহা নহে, তিনি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহাকে সম্ভবপররূপে স্থায়ী করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিতেও চাহি না এইরূপ মেয়ের অস্তিত্ব বাংলাদেশে সাধারণত সত্য কি না এবং সেই সত্যটি সঞ্জীবের দ্বারা

আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না। আমরা কেবল অনুভব করি, ছবিটি সুন্দর বটে এবং অসম্ভবও নহে।

সঞ্জীববাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন, 'বাল্যকালে আমার মনে হইত যে, ভূত প্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন, অন্যের দেহ-আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেই প্রকার অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়; কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষত মানবী, কিন্তু বৃক্ষ-পল্লব নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে।...সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্রভেদ।'

সঞ্জীববাবুর এই মতটি অবলম্বন করিয়া চন্দ্রনাথবাবু বলিয়াছেন, 'সঞ্জীববাবুর সৌন্দর্যতত্ত্ব ভালো করিয়া না বুঝিলে তাঁহার লেখাও ভালো করিয়া বুঝা যায় না, ভালো করিয়া সম্ভোগ করা যায় না।'

সমালোচকের এ কথায় আমরা কিছুতেই সায় দিতে পারি না। কোনো-একটি বিশেষ সৌন্দর্যতত্ত্ব অবলম্বন না করিলে সঞ্জীবের রচনার সৌন্দর্য বুঝা যায় না, এ কথা যদি সত্য হইত তবে তাঁহার রচনা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য হইত না। নদনদীতেও সৌন্দর্য আছে, পুষ্পে নক্ষত্রেও সৌন্দর্য আছে, মনুষ্যে পশুপক্ষীতেও সৌন্দর্য আছে, এ কথা প্লেটো না পড়িয়াও আমরা জানিতাম— সেই সৌন্দর্য ভূতের মতো বাহির হইতে আসিয়া বস্তুবিশেষে আবির্ভূত হয় অথবা তাহা বস্তুর এবং আমাদের প্রকৃতির বিশেষ ধর্ম-বশত আমাদের মনের মধ্যে উদিত হয়, সে-সমস্ত তত্ত্বের সহিত সৌন্দর্যসম্ভোগের কিছুমাত্র যোগ নাই। এক জন নিরক্ষর ব্যক্তিও যখন তাহার প্রিয়মুখকে চাঁদমুখ বলে তখন সে কোনো বিশেষ তত্ত্ব না পড়িয়াও স্বীকার করে যে, যদিচ চাঁদ এবং তাহার প্রিয়জন বস্তুত সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ তথাপি চাঁদের দর্শন হইতে সে যে-জাতীয় সুখ অনুভব করে তাহার প্রিয়মুখ হইতেও ঠিক সেই-জাতীয় সুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হয়।

চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমাদের মতভেদ কিছু বিস্তারিত করিয়া বলিলাম ; তাহার কারণ এই যে, এই উপায়ে পাঠকগণ অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন আমরা সাহিত্যকে কী নজরে দেখিয়া থাকি। এবং ইহাও বুঝিবেন, যাহা প্রকৃতপক্ষে সহজ এবং সর্বজনগম্য, আজকালকার সমালোচন-প্রণালীতে তাহাকে জটিল করিয়া তুলিয়া পুরাতনকে একটা নূতন ঘর-গড়া আকার দিয়া পাঠকের নিকট ধরিবার চেষ্টা করা হয়। ভালো কাব্যের সমালোচনায় পাঠকের হৃদয়ে সৌন্দর্য সঞ্চার করিবার দিকে লক্ষ না রাখিয়া নূতন এবং কঠিন কথায় পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দিবার প্রয়াস আজকাল দেখা যায় ; তাহাতে সমালোচনা সত্য হয় না, সহজ হয় না, সুন্দর হয় না, অত্যন্ত আশ্চর্যজনক হইয়া উঠে।

গ্রন্থকার কোল-যুবতীদের নৃত্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্‌ধৃত করি—

'এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল ; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড়ো হাসির ঘটা পড়িয়া গেল! উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে, যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা— যুবা দশ বারোটি, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশ জন ; সেই চল্লিশ জনে হাসিলে হাইলণ্ডের পল্টন ঠকে। হাস্য উপহাস্য শেষ হইলে নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড়ো চমৎকার হইল। সকলগুলিই সম-উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কালো ; সকলেরই অনাবৃত দেহ ; সকলেরই সেই অনাবৃত বক্ষে আর্শির ধুক্‌ধুকি চন্দ্রকিরণে এক-একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল— যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ

সংযম করিতেছে।

'সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, যুবাদের পশ্চাতে মৃন্ময়মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে তবে যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল।'

এই বর্ণনাটি সুন্দর, ইহা ছাড়া আর কী বলিবার আছে? এবং ইহা অপেক্ষা প্রশংসার বিষয়ই বা কী হইতে পারে? নৃত্যের পূর্বে আহ্লাদে চঞ্চল যুবতীগণ তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় দেহবেগ সংযত করিয়া আছে, এ কথায় যে চিত্র আমাদের মনে উদয় হয় সে আমাদের কল্পনা-শক্তি-প্রভাবে হয়, কোনো বিশেষ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা হয় না। 'যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল, এ কথা বলিলে ত্বরিত আমাদের মনে একটা ভাবের উদয় হয়; যে কথাটা সহজে বর্ণনা করা দুরূহ তাহা ঐ উপমা-দ্বারা এক পলকে আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়। নৃত্যের বাদ্য বাজিবামাত্র চিরাভ্যাসক্রমে কোল-রমণীদের সর্বাঙ্গে একটা উদ্দাম উৎসাহচাঞ্চল্য তরঙ্গিত হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যেন একটা জানাজানি কানাকানি, একটা সচকিত উদ্যম, একটা উৎসবের আয়োজন পড়িয়া গেল— যদি আমাদের দিব্য কর্ণ থাকিত তবে যেন আমরা তাহাদের নৃত্যবেগে উল্লসিত দেহের কল-কোলাহল শুনিতে পাইতাম। নৃত্যবাদ্যের প্রথম আঘাতমাত্রেই যৌবনসন্নদ্ধ কোলাঙ্গনাগণের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বিভঙ্গিত এই-যে একটা হিল্লোল ইহা এমন সূক্ষ্ম, ইহার এতটা কেবল আমাদের অনুমানবোধ্য এবং ভাবগম্য যে, তাহা বর্ণনায় পরিস্ফুট করিতে হইলে 'কোলাহলে'র উপমা অবলম্বন করিতে হয়— এতদ্‌ব্যতীত ইহার মধ্যে আর-কোনো গূঢ়তত্ত্ব নাই। যদি এই উপমা-দ্বারা লেখকের মনোগত ভাব পরিস্ফুট

না হইয়া থাকে, তবে ইহার অন্য কোনো সার্থকতা নাই, তবে ইহা প্রলাপোক্তি মাত্র।

বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরী যখন পদ্মবীজমালা হস্তে মহাদেবের তপোবনে প্রবেশ করিতেছেন তখন কালিদাস তাঁহাকে 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' বলিয়াছেন; সঙ্গিনীপরিবৃতা সুন্দরী রাধিকা যখন দৃষ্টিপথে প্রবেশ করিলেন তখন গোবিন্দদাস তাঁহাকে মোহিনী পঞ্চম রাগিণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কোনো বিশেষ সৌন্দর্যতত্ত্ব ছিল কি না জানি না, কিন্তু এরূপ বিসদৃশ উপমাপ্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, দক্ষিণবায়ুতে বসন্তকালের পল্লবে-ভরা লতার আন্দোলন আমরা অনেকবার দেখিয়াছি; তাহার সেই সৌন্দর্যভঙ্গী আমাদের নিকট সুপরিচিত; সেই উপমাটি প্রয়োগ করিবামাত্র আমাদের বহুকালের সঞ্চিত পরিচিত একটি সৌন্দর্যভাবে ভূষিত হইয়া এক কথায় গৌরী আমাদের হৃদয়ে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠেন— আমরা জানি রাগিণী আমাদের মনে কী-একটি বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের ব্যাকুলতা সঞ্চার করে, এইজন্য পঞ্চম রাগিণীর সহিত রাধিকার তুলনা করিবামাত্র আমাদের মনে যে-একটি অনির্দেশ্য অথচ চিরপরিচিত মধুর ভাবের উদ্রেক হয় তাহা কোনো বর্ণনাবাহুল্যের দ্বারা হইত না। অতএব দেখা যাইতেছে, অন্য সৌন্দর্যরাজ্যে সঞ্জীববাবু তাঁহার নিজের রচিত একটা নূতন গলি কাটেন নাই, সমুদয় ভাবুক ও কবিবর্গের পুরাতন রাজপথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন এবং সেই তাঁহার গৌরব।

সঞ্জীব একটি যুবতীর বর্ণনার মধ্যে বলিয়াছেন, 'তাহার যুগ্ম ভ্রূ দেখিয়া আমার মনে হইল যেন অতি উর্ধ্বে নীল আকাশে কোনো বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে।' এই উপমাটি পড়িবামাত্র মনে বড়ো একটি আনন্দের উদয় হয়। কেবলমাত্র উপমাসাদৃশ্য তাহার কারণ নহে, কিন্তু সেই সাদৃশ্যটুকুকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া একটা সৌন্দর্যের

সহিত আর-কতগুলি সৌন্দর্য জড়িত হইয়া যায়— সে একটা ইন্দ্রজালের মতো ; ঠিক করিয়া বলা শক্ত যে অপরাহ্নের অতি দূর নির্মল নীলাকাশে ভাসমান স্থিরপক্ষ স্থগিতগতি পাখিটিকে দেখিতেছি, না, যুবতীর শুভ্র সুন্দর ললাটতলে অঙ্কিত একটি জোড়া ভুরু আমাদের চক্ষে পড়িতেছে। জানি না, কেমন করিয়া কী মন্ত্রবলে একটি ক্ষুদ্র ললাটের উপর সহসা আলোকধৌত নীলাম্বরের অনন্ত বিস্তার আসিয়া পড়ে এবং মনে হয় যেন রমণীমুখের সেই ভ্রূযুগল দেখিতে স্থির দৃষ্টিকে বহু উচ্চে বহু দূরে প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। এই উপমায় হঠাৎ এইরূপ একটা বিভ্রম উৎপন্ন করে, কিন্তু সেই ভ্রমের কুহকেই সৌন্দর্য ঘনীভূত হইয়া উঠে।

অবশেষে গ্রন্থ হইতে একটি সরল বর্ণনার উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। গ্রন্থকার একটি নিদ্রিত বাঘের বর্ণনা করিতেছেন—

'প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভালোমানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে ; মুখের নিকট সুন্দর-নখর-সংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয় নিদ্রার পূর্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল।'

আহারপরিতৃপ্ত সুপ্তশান্ত ব্যাঘ্রটি ঐ-যে মুখের সামনে একটি থাবা উল্‌টাইয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এই এক কথায় ঘুমন্ত বাঘের ছবিটি যেমন সুস্পষ্ট সত্য হইয়া উঠিয়াছে এমন আর-কিছুতে হইতে পারিত না। সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিস সজীব কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।

পৌষ ১৩০১

বিদ্যাপতির রাধিকা

গতি এবং উত্তাপ যেমন একই শক্তির ভিন্ন অবস্থা, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমশক্তির সেই প্রকার দুই ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য ; চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক। এইজন্য ছন্দ সংগীত এবং বিচিত্র রঙে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্যসুখসম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা। ইহা কেবল যৌবনের প্রথম আরম্ভের আনন্দোচ্ছ্বাস। কেবল অবিমিশ্র সুখ এবং অব্যাহত সংগীতধ্বনি। দুঃখ নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সুখদুঃখের মাঝখানে একটা অন্তরাল ব্যবধান আছে। হয় সুখ নয় দুঃখ, হয় মিলন নয় বিরহ এইরূপ পরিষ্কার শ্রেণীবিভাগ। চণ্ডীদাসের মতো সুখে দুঃখে বিরহে মিলনে জড়িত হইয়া যায় নাই। সেইজন্য বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।

অল্প বয়সের ধর্মই এই, সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ অত্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া দেখে। যেন জগতে এক দিকে বিশুদ্ধ ভালো আর-এক দিকে বিশুদ্ধ মন্দ, এক দিকে একান্ত সুখ আর-এক দিকে একান্ত দুঃখ প্রতিপক্ষতা অবলম্বন করিয়া পরস্পর বিমুখ হইয়া বসিয়া আছে। সে বয়সে সকল বিষয়ের একটা পরিপূর্ণ আদর্শ হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকে। গুণ দেখিলেই সর্বগুণ কল্পনা করি, দোষ দেখিলেই সর্বদোষ একত্র হইয়া পিশাচমূর্তি ধারণ করে। সুখ দেখা দিলেই ত্রিভুবনে দুঃখের চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যায়, এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে কোথাও সুখের লেশমাত্র দেখা যায় না। সংগীত সেইজন্য সর্বদাই উচ্ছ্বসিত পঞ্চমস্বরে বাঁধা। বিদ্যাপতিতে সেইজন্য কেবল বসন্ত।

রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য

ঢলঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারি দিকে একটা যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়-চক্ষে দৃষ্টি। একটু ব্যাকুলতা, একটু আশা-নৈরাশ্যের আন্দোলনও আছে— কিন্তু তাহা নিতান্ত মর্মঘাতী নহে। চণ্ডীদাসের যেমন—

নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল,
নিমিখে নিমিখ নাহি হয়—

বিদ্যাপতিতে সেরূপ উতরোল ভাব নয়, কতকটা উতলা বটে। কেবল আপনাকে আধখানা প্রকাশ এবং আধখানা গোপন ; কেবল হঠাৎ উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলনে অমনি খানিকটা উন্মেষিত হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির রাধা নবীনা, নবস্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভালো করিয়া জানে না। দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক-অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে। যেমন একটি ভীরু বালিকা স্বাভাবিক পশুস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া অজ্ঞাতস্বভাব মৃগকে একবার সচকিতে স্পর্শ করে, একবার পালায়, ক্রমে ক্রমে ভয় ভাঙে, সেইরূপ।

যৌবন, সেও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলই রহস্যপরিপূর্ণ। সদ্যবিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে ; আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে ; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না—

কবহুঁ বাঁধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি।

হৃদয়ের নবীন বাসনাসকল পাখা মেলিয়া উড়িতে চায়, কিন্তু এখনো

পথ জানে নাই। কৌতূহল এবং অনভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয়, আবার জড়সড় অঞ্চলটির অন্তরালে আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

এখন প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস বেশি। ইহাতে গভীরতার অটল স্থৈর্য নাই, কেবল নবানুরাগের উদ্‌ভ্রান্ত লীলাচাঞ্চল্য। বিদ্যাপতির এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটি সমীরচঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। ঢেউ খেলিতেছে, ফেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, মেঘের ছায়া পড়িতেছে, স্র্যের আলোক শত শত অংশে প্রতিস্ফুরিত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে; তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং পলায়ন, কলরব কলহাস্য করতালি, কেবল নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং আন্দোলন, আলোক এবং বর্ণবৈচিত্র্য। এই নবীন চঞ্চল প্রেম-হিল্লোলের উপর সৌন্দর্য যে কত ছন্দে কত ভঙ্গীতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীতিতরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।

কদাচ কখনো দেখা হয়, যমুনার জলে অথবা স্নান করিয়া ফিরিবার সময়। কিন্তু ভালো করিয়া দেখা হয় না। একে অল্পক্ষণের দেখা, তাহাতে অধৈর্যচঞ্চল দোদুল্যমান হৃদয়ে সৌন্দর্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়। মনকে শান্ত করিয়া ধৈর্য ধরিয়া দেখিবার অবসর পাওয়া যায় না। যেটুকু দেখা গেল সে কেবল—

আধ আঁচর খসি আধ বদনে হসি
আধ হি নয়ানতরঙ্গ।

কিন্তু 'ভালো করি পেখন না ভেল'।

তাহার পর কত আসা-যাওয়া কত বলা-কওয়া, কত ছলে কত ভাবপ্রকাশ, কত ভয় কত ভাবনা— অবশেষে একদিন মধুর, বসন্তে

নবীন মিলন ; কিন্তু তাহাও নিবিড় নিগূঢ় নিরতিশয় মিলন নহে। তাহার মধ্যে কত আশঙ্কা কত আশ্বাস, কত কৌতুক কত ছদ্মলীলা, কত মান-অভিমান সাধ্যসাধনা। আবার সখীর সহিত পরামর্শ ; সখীকে ডাকিয়া গৃহকোণে নিভৃতে বসিয়া নানা ছলে এবং কথার কৌশলে আপনার সুখস্মৃতি লইয়া আলোচনা। নবীনার নব প্রেম যেমন মুগ্ধ, যেমন মিশ্রিত, বিচিত্র, কৌতুককৌতূহলপরিপূর্ণ হইয়া থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই কম নাই।

চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর।

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ,
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দীপুলিনকুঞ্জ নবশোভন,
নব নব প্রেমবিভোর॥
নবীন রসালমুকুলমধু মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই
নব রসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতিমতি মাতি॥

ইহার সহিত আর-একটি গীত যোগ না করিলে ইহা সম্পূর্ণ হয় না—

মধু ঋতু, মধুকরপাঁতি
মধুর-কুসুম-মধু-মাতি।
মধুর বৃন্দাবনমাঝ
মধুর মধুর রসরাজ।
মধুরযুবতীগণসঙ্গ
মধুর মধুর রসরঙ্গ।
মধুর যন্ত্র স্থরসাল,
মধুর মধুর করতাল।
মধুর নটনগতিভঙ্গ,
মধুর নটিনীনটরঙ্গ।
মধুর মধুর রসগান,
মধুর বিদ্যাপতি ভান।

এইখানেই শেষ করা যাইত। কিন্তু এখানে শেষ করিলে বড়ো অসমাপ্ত থাকে। ঠিক সমে আসিয়া থামে না। এইজন্য বিদ্যাপতি একটি শেষ কথা বলিয়া রাখিয়াছেন। তাহাকে শেষ কথা বলা যাইতে পারে, অশেষ কথাও বলা যাইতে পারে। এত লীলাখেলা নব নব রসোল্লাসের পরিণাম-কথা এই যে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

নবীন প্রেম একেবারে লক্ষ লক্ষ যুগের পুরাতন হইয়া গেল। ইহার পরে ছন্দ এবং রাগিণী পরিবর্তন করা আবশ্যক। চিরনবীন প্রেমের ভূমিকা সমাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাস আসিয়া চিরপুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।

চৈত্র ১২৯৮

কৃষ্ণচরিত্র

প্রথম ইংরাজি শিক্ষা পাইয়া আমরা যখন রাজনীতির সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিলাম, সমাজনীতি এবং ধর্মনীতিও সেই নিষ্ঠুর পরীক্ষার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয় নাই। তখন ছাত্রমাত্রেরই মনে আমাদের সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে একটা অসন্তোষ ও সংশয়ের উদ্রেক হইয়াছিল।

বিচারের পর কাজের পালা। মতের দ্বারা ভালোমন্দ স্থির করা কঠিন নহে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তদনুসারে আপন কর্তব্য নিয়মিত করা অত্যন্ত দুরূহ। রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের নিজের কর্তব্য অতি যৎসামান্য ; কারণ, রাজত্বের অধিকার আমাদের হস্তে কিছুই নাই। এইজন্য পোলিটিকাল সমালোচনা এখনো অত্যন্ত তীব্র ও প্রবলভাবে চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে কোনোপ্রকার দ্বিধা অথবা বাধা অনুভব করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই। কিন্তু সমাজ ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় কর্তব্য আমাদের নিজের হাতে ; অতএব ধর্ম ও সমাজনীতি সম্বন্ধে বিচারে যাহা স্থির হয় কাজে তাহার প্রয়োগ না হইলে সেজন্য আপনাকে ছাড়া আর-কাহাকেও দোষী করা যায় না। মানুষ বেশিক্ষণ আপনাকে দোষী করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, এবং নিজের প্রতি দোষারোপ করিয়া অম্লানবদনে বসিয়া থাকাও তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। এইজন্য সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে এক-একটি কৈফিয়ত বাহির করিয়া আমরা মনকে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করিলাম। অবশেষে এমন হইল যে, আমাদের যাহা-কিছু আছে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইহা আমরা কিছু অধিক উচ্চস্বরে এবং প্রাণপণ বল-সহকারে ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এরূপ ব্যবহার যে কপট ও কৃত্রিম আমি তাহা বলি না। বস্তুত, সমাজ ও ধর্মের মূল জাতীয় প্রকৃতির এমন গভীরতম দেশে অনুপ্রবিষ্ট যে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে নানা দিক্ হইতে নানা গুরুতর

বাধা আসিয়া পড়ে এবং পুরাতন অমঙ্গলের স্থলে নূতন অমঙ্গল মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। এমন স্থলে শঙ্কিতচিত্তে পুনরায় নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হয় এবং সেই নিশ্চেষ্টতার পথে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত স্পর্ধার সহিত আস্ফালন করাও অস্বাভাবিক নহে— বুক ফুলাইয়া সর্বসাধারণকে বলিতে ইচ্ছা করে, ইহা আমাদের হার নহে, জিত।

আমাদের বঙ্গসমাজের এইরূপ উল্টারথের দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ-চরিত্র' রচিত হয়। যখন বড়ো ছোটো অনেকে মিলিয়া জনতার স্বরে স্বর মিলাইয়া গোলে হরিবোল দিতেছিলেন তখন প্রতিভার কণ্ঠে একটা নূতন সুর বাজিয়া উঠিল; বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র গোলে হরিবোল নহে। ইহাতে সর্বসাধারণের সমর্থন নাই, সর্বসাধারণের প্রতি অনু-শাসন আছে।

যে সময়ে কৃষ্ণচরিত্র রচিত হইয়াছে সেই সময়ের গতি এবং বঙ্কিমের চতুর্দিক্-বর্তী অনুবর্তীগণের ভাবভঙ্গী বিচার করিয়া দেখিলে, এই কৃষ্ণ-চরিত্র গ্রন্থে প্রতিভার একটি প্রবল স্বাধীন বল অনুভব করা যায়।

সেই বলটি আমাদের একটি স্থায়ী লাভ। সেই বলটি বাঙালির পরম আবশ্যক। সেই বল স্থানে স্থানে ন্যায় এবং শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, তথাপি তাহা আমাদের ন্যায় হীনবীর্য ভীরুদের পক্ষে একটি অভয় আশ্রয়দণ্ড।

যখন আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্ধ-ভাবে শাস্ত্রের জয় ঘোষণা করিতেছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বীরদর্পসহকারে কৃষ্ণচরিত্র-গ্রন্থে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক যুক্তিদ্বারা তন্নতন্নরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং চিরপ্রচলিত বিশ্বাসগুলিকেও বিচারের অধীনে আনয়নপূর্বক অপ-মানিত বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনশ্চ তাহার গৌরবের সিংহাসনে রাজপদে

অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের মতে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি। প্রথমত বঙ্কিম বুঝাইয়াছেন, জড়ভাবে শাস্ত্রের অথবা লোকাচারের অনুবর্তী হইয়া আমরা পূজা করিব না, সতর্কতার সহিত আমাদের মনের উচ্চতম আদর্শের অনুবর্তী হইয়া পূজা করিব। তাহার পরে দেখাইয়াছেন, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র। এই মূল ভাবটিই কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের ভিতরকার অধ্যাত্মশক্তি, ইহাই সমস্ত গ্রন্থটিকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

বর্তমান গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রের শ্রেষ্ঠতা এবং ঐতিহাসিকতা প্রমাণের বিষয়। গ্রন্থের প্রথমাংশে লেখক ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণচরিত্রের রীতিমত ইতিহাস-সমালোচনা এই প্রথম। ইতিপূর্বে কেহ তাহার সূত্রপাত করিয়া যায় নাই; এইজন্য ভাঙিবার এবং গড়িবার ভার উভয়ই বঙ্কিমকে লইতে হইয়াছে। কোন্‌টা ইতিহাস তাহা স্থির করিবার পূর্বে কোন্‌টা ইতিহাস নহে তাহা নির্ণয় করা বিপুল পরিশ্রমের ও বিচক্ষণতার কাজ। আমাদের বিবেচনায় বর্তমান গ্রন্থে বঙ্কিম সেই ভাঙিবার কাজ অনেকটা পরিমাণে শেষ করিয়াছেন, গড়িবার কাজে ভালো করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই।

মহাভারতকেই বঙ্কিম প্রধানত আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মহাভারতের মধ্যে বিস্তর প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। অথচ ঠিক কোন্‌টুকু যে মূল মহাভারত তাহা তিনি স্থাপনা করিয়া যান নাই। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, 'প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়াসিকী সংহিতা নহে, ইহা বৈশম্পায়ন সংহিতা বলিয়া পরিচিত; কিন্তু আমরা প্রকৃত বৈশম্পায়ন সংহিতা পাইয়াছি কি না তাহা সন্দেহ। তার পরে প্রমাণ করিয়াছি যে, ইহার প্রায় তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত।'

বঙ্কিম মহাভারতের তিনটি স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথম স্তরের

রচনা উদার ও উচ্চকবিত্বপূর্ণ, দ্বিতীয় স্তরের রচনা অনুদার এবং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত এবং তৃতীয় স্তর বহু কালের বহুবিধ লোকের যদৃচ্ছামত রচনা।

এ কথা পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য যে, কাব্যাংশের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করিয়া স্তর নির্ণয় করা নিতান্তই আনুমানিক। রুচিভেদে কবিত্ব ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। আবার, একই কবির রচনার এক অংশ অপরাংশের সহিত কবিত্ব হিসাবে আকাশ পাতাল তফাত হয় এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। অতএব ভাষার প্রভেদ ঐতিহাসিকের প্রধান সমালোচ্য বিষয়, কবিত্বের প্রভেদ নহে। মহাভারতের মধ্যে এই ভাষার অনুসরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা নির্ণয় করা এবং মূল মহাভারত নির্বাচন করা প্রভূতশ্রমসাধ্য।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ভালো কবির রচনায় ভালো কাব্য থাকিতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিকতা কবিত্বের উপর নির্ভর করে না। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-বিবরণ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে নানা স্থানের লোকের মুখে নানা গল্প প্রচলিত ছিল। কোনো উৎকৃষ্ট কবি সেই-সকল গল্পের মধ্য হইতে তাঁহার কবিত্বের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ ও সংগঠন করিয়া লইয়া একটি সুসংগত সুন্দর কাব্য রচনা করিয়া থাকিতে পারেন এবং অনেক অকবি ও কুকবি -বর্গ তাঁহার সেই কাব্যের মধ্যে তাঁহাদের নিজের জানা ইতিহাস জুড়িয়া দিতে পারেন। সে স্থলে সুকাব্যের অপেক্ষা অকাব্য ঐতিহাসিক হিসাবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য হইতে পারে। এ কথা কাহারও অবিদিত নাই যে, কাব্য হিসাবে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতে হইলে সমগ্র ইতিহাসকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা যায় না। শেক্‌স্‌পীয়ারের কোনো ঐতিহাসিক নাটকে যদি পরবর্তী সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ ঐতিহাসিক অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া দিবার জন্য নিজ নিজ রচনা নির্বিচারে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিতে থাকেন তবে তাহাতে কাব্যের কত ত্রুটি, মূলের সহিত

কত অসামঞ্জস্য এবং শেক্‌স্‌পীয়ার-বর্ণিত চরিত্রের সহিত কত বিরোধ ঘটিতে থাকে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, সে স্থলে কাব্যসমালোচক কবিত্ব বিচার করিয়া শেক্‌স্‌পীয়ারের মূল নাটক উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু ইতিহাস-সমালোচক ইতিহাস-উদ্ধারের জন্য একমাত্র শেক্‌স্‌পীয়ারের মূলগ্রন্থের উপরেই নির্ভর করিবেন এমন কথা বলিতে পারি না।

যাহা হউক, মহাভারতে যে নানা কালের নানা লোকের রচনা আছে তাহা স্বীকার্য; কিন্তু তাহাদিগকে পৃথক করিয়া তাহাদের রচনাকাল ও তাহাদের আপেক্ষিক সত্যাসত্য-নির্ণয় যে কেমন করিয়া সাধিত হইতে পারে তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

কেবল, বঙ্কিমবাবু অনৈতিহাসিকতার একটি যে লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না; তাহা অনৈসর্গিকতা। প্রথমত, যাহা অনৈসর্গিক তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের যে অংশে অনৈসর্গিকতা দেখা যায় সে অংশ যে ঘটনাকালের বহু পরে রচিত তাহা মোটামুটি বলা যাইতে পারে।

বঙ্কিমবাবু অনৈতিহাসিকতার আর-একটি যে লক্ষণ স্থির করিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। যে অংশে কোনো ঐতিহাসিক মহৎ ব্যক্তি দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন সে অংশও যে পরবর্তী কালের যোজনা তাহা সুনিশ্চিত।

অতএব বঙ্কিম যে-সকল স্থলে কৃষ্ণচরিত্র হইতে অতিপ্রাকৃত অমানুষিক অংশ বর্জন করিয়াছেন সে স্থলে কোনো ঐতিহাসিকের মনে বিরুদ্ধ তর্ক উদয় হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে তিনি মহাভারতের একাংশের সহিত অসংগত বলিয়া কিছু পরিত্যাগ করিয়াছেন সেখানে পাঠকের মন নিঃসংশয় হইতে পারে না। কারণ, একটা বড়ো লোক এবং বড়ো ঘটনা সম্বন্ধে দেশে বিচিত্র জনশ্রুতি প্রচলিত থাকে।

সেই-সকল জনশ্রুতি বর্জন এবং মার্জন -পূর্বক ভিন্ন কবি আপন আদর্শ-অনুযায়ী ভিন্নরূপ কাব্য রচনা করিতে পারেন। কেহ বা শ্রীকৃষ্ণকে পরমধর্মশীল দেবপ্রকৃতি মানুষ বলিয়া গড়িতে পারেন, কেহ বা তাঁহাকে কূটবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ চক্রীরূপে চিত্রিত করিতে পারেন। সম্ভবত উভয়েরই চিত্র অসম্পূর্ণ। এবং পরস্পরবিরোধী হইলেও সম্ভবত উভয়ের রচনাতেই আংশিক সত্য আছে। বস্তুত, নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন ইতিহাস হিসাবে কে বেশি নির্ভরযোগ্য।

এই হেতু বঙ্কিম মহাভারত-বর্ণিত কৃষ্ণের প্রত্যেক উক্তি এবং মত যতটা বিস্তারিত ব্যাখ্যার সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহা হইতে যে ঐতিহাসিক চরিত্র গঠন করিয়াছেন তাহা আমাদের মতে যথেষ্ট তথ্যমূলক নহে। বঙ্কিমবাবুও মধ্যে মধ্যে বলিয়াছেন যে, মহাভারতে কৃষ্ণের মুখে যত কথা বসানো হইয়াছে সবই যে কৃষ্ণ বাস্তবিক বলিয়াছিলেন তাহা নহে, তদ্দ্বারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে কবির কিরূপ ধারণা ছিল তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু কবির আদর্শকে সর্বতোভাবে ঐতিহাসিক আদর্শের অনুরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, কবির কাব্য ব্যতীত অন্যান্য অনুকূল প্রমাণের আবশ্যক। আমরা একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করি। বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন—

'কুন্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধূর দুঃখের বিবরণ স্মরণ করিয়া কৃষ্ণের নিকট অনেক কাঁদাকাঁটা করিলেন। উত্তরে কৃষ্ণ যাহা তাঁহাকে বলিলেন তাহা অমূল্য। যে ব্যক্তি মনুষ্যচরিত্রের সর্বপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে সে ভিন্ন আর-কেহই সে কথার অমূল্যত্ব বুঝিবে না। মূর্খের তো কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'পাণ্ডবগণ নিদ্রা তন্দ্রা ক্রোধ হর্ষ ক্ষুধা পিপাসা হিম রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন। সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হয়েন না।

বীর ব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ নাহয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন, আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।' '

বঙ্কিমবাবু মহাভারত হইতে কৃষ্ণের যে উক্তি উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহা সুগভীর ভাবগর্ভ উপদেশে পূর্ণ। কিন্তু ইহা হইতে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের চরিত্রনির্ণয়ের বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় এমন আমরা বিশ্বাস করি না। ইহাতে মহাভারতকার কবির মানবচরিত্রজ্ঞতা এবং হৃদয়ের উচ্চতা প্রকাশ করে। উদ্যোগপর্বের নবতিতম অধ্যায়ে কৃষ্ণের এই উক্তি বর্ণিত আছে; ইহার প্রায় চল্লিশ অধ্যায় পরেই কুন্তীর মুখে বিদুলাসঞ্জয়সংবাদ-নামক একটি পুরাতন কাহিনী সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে তেজস্বিনী বিদুলা তাঁহার যুদ্ধচেষ্টাবিমুখ পুত্র সঞ্জয়কে ক্ষত্রধর্মে উৎসাহিত করিবার জন্য যে কথাগুলি বলিয়াছেন কৃষ্ণের পূর্বোদ্‌ধৃত উক্তির সহিত তাহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বিদুলা বলিতেছেন, 'এখনো পুরুষোচিত চিন্তাভার বহন করো। অল্পদ্বারা পরিতৃপ্ত রাখিয়া অপরিমেয় আত্মাকে অনর্থক অবমানিত করিয়ো না।··· ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্নগাসকল যেমন অল্প জলেই পরিপূর্ণা হয় এবং মূষিকের অঞ্জলি যেমন অল্প দ্রব্যেই পূর্ণ হইয়া উঠে সেইরূপ কাপুরুষেরাও অত্যল্পমাত্রে পরিতৃপ্ত হওয়ায় সহজেই সন্তুষ্ট হইতে থাকে।··· চিরকাল ধূমিত হওয়া অপেক্ষা মুহূর্তকাল জ্বলিত হওয়াও শতগুণে শ্রেষ্ঠ।··· ইহসংসারে প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ অত্যল্প বস্তুকে অপ্রিয় বোধ করেন, অত্যল্প বস্তু যাহার প্রিয় হয় তাহার সেই অল্প বস্তুই নিশ্চয় অনিষ্টকর হইয়া থাকে। যাহারা ফলের অনিত্যত্ব স্থির করিয়াও কর্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ না হয় তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেও পারে, না হইতেও পারে; কিন্তু অনিশ্চিতবোধে যাহারা একেবারেই অনুষ্ঠানে বিরত হয় তাহারা আর কস্মিন্ কালেও কৃতকার্য হইতে পারে না।'

ইহা হইতে এই দেখা যাইতেছে যে, কর্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে

মহাভারতের কবির আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ ছিল এবং সেই আদর্শ তিনি নানা উদাহরণের দ্বারা নানা স্থানে প্রচার করিয়াছেন। মহাভারত ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে এমন কল্পনা করাও অসংগত হয় না যে, এক সময়ে ভারতে কর্মধর্মের শ্রেষ্ঠতা-ঘোষণার উদ্দেশে কবি লোকবিখ্যাত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত মহাকাব্যে গ্রথিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ অর্জুন ভীষ্ম ভীম কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতি মহাভারতের প্রধান নায়কগুলি মাত্রেই কর্মবীরের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল। এমন-কি, গান্ধারী এবং দ্রৌপদীও কর্তব্যনিষ্ঠার মহিমায় দীপ্তিমতী। সেইজন্য গান্ধারী দুর্যোধনকে ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন, অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয় বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।

অতএব বঙ্কিম যাহা বলিতেছেন তাহাতে যদি প্রমাণের কোনো ত্রুটি না থাকে তবে তদ্দ্বারা ইহাই স্থির হইয়াছে যে, কোনো-একটি অজ্ঞাতনামা কবির মনে মহত্ত্বের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল এবং তাঁহার সেই উচ্চতম আদর্শ-সৃষ্টিই মহাভারতের কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ঐতিহাসিক হইতে পারেন, কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণ যে সর্বাংশে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের প্রতিরূপ তাহার কোনো প্রমাণ নাই। ইহাও দেখা যাইতেছে যে, এই মহাভারতেই ভিন্ন লোক ভিন্ন আদর্শের কৃষ্ণ সংগঠন করিয়াছেন।

যেখানে এক সাক্ষী বিরোধী কথা কহিতেছে সেখানে অন্যান্য সাক্ষী ডাকিয়া সত্য সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু দেখাইয়াছেন, মহাভারতে কৃষ্ণের জীবনের যে অংশ বর্ণিত হইয়াছে অন্য কোনো পুরাণেই তাহা হয় নাই ; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য তুলনা করিয়া সত্য উদ্ধারের যে উপায় আছে এ স্থলে তাহাও নাই।

অতএব বঙ্কিমবাবুর প্রমাণমত দেখিতে পাইতেছি, ব্যাসরচিত মূল মহাভারত বর্তমান নাই। এখন যে মহাভারত পাওয়া যায় তাহা ব্যাসের

মুখ হইতে বৈশম্পায়ন, বৈশম্পায়নের মুখ হইতে উগ্রশ্রবার পিতা, পিতার মুখ হইতে উগ্রশ্রবা, এবং উগ্রশ্রবার মুখ হইতে অন্য কোনো-একজন কবি সংগ্রহ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, এ মহাভারতের মধ্যেও কালক্রমে নানা লোকের রচনা মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বিশ্লিষ্ট করিবার কোনো নির্ভরযোগ্য উপায় আপাতত স্থির হয় নাই। তৃতীয়ত, অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তুলনাদ্বারা মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিবারও পথ নাই।

বঙ্কিম প্রধানত কৃষ্ণচরিত্রকেই উপলক্ষ্য করিয়া কেবল প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা বিচার করিয়াছেন; কিন্তু প্রথমে প্রমাণ ও বিচার -প্রয়োগপূর্বক প্রধানত সমস্ত মহাভারতের ইতিহাস-অংশ বাহির করিলে পর, তবে কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা সন্তোষজনকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

উদাহরণস্বরূপে বলিতে পারি, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিগ্রহণ প্রামাণিক সত্য কি না সে বিষয়ে বঙ্কিম সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব দেখা আবশ্যক, বঙ্কিম যাহাকে মূল মহাভারত বলিতেছেন তাহার সর্বত্র হইতেই দ্রৌপদীর পঞ্চপতিগ্রহণ বর্জন করা যায় কি না, এবং বঙ্কিম মহাভারতের যে যে অংশ হইতে কৃষ্ণচরিত্রের ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন, সেই সেই অংশে দ্রৌপদীর পঞ্চপতিচর্যা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নাই কি না। বঙ্কিম মহাভারত-বর্ণিত যে-সকল ঘটনাকে অনৈতিহাসিক মনে করেন সে-সমস্ত যদি তিনি তাঁহার কল্পিত মূল মহাভারত হইতে প্রমাণসহকারে দূর করিয়া দিতে পারেন, তবে আমরা তাঁহার নির্বাচিত অংশকে বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসরূপে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। কিন্তু মহাভারতের ঠিক কতটুকু মূল ঐতিহাসিক অংশ তাহা বঙ্কিম সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট করেন নাই, তিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণচরিত্রের ধারাটি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এক স্থানে

বলিয়াছেন—

'আমিও বিশ্বাস করি না যে, যজ্ঞের অগ্নি হইতে দ্রুপদ কন্যা পাইয়াছিলেন, অথবা সেই কন্যার পাঁচটি স্বামী ছিল। তবে দ্রুপদের ঔরসকন্যা থাকা অসম্ভব নহে, এবং তাঁহার স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল এবং সেই স্বয়ংবরে অর্জুন লক্ষ্যবেধ করিয়াছিলেন ইহা অবিশ্বাস করিবারও কারণ নাই। তার পর, তাঁহার পাঁচ স্বামী হইয়াছিল কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কথার মীমাংসায় আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই।'

প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। কারণ, বঙ্কিম মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সেইজন্যই মহাভারত-বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রকে তিনি ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীবিবাহ ব্যাপারটি তুচ্ছ নহে ; কিন্তু এত বড়ো ঘটনাটি যদি মিথ্যা হয় এবং সেই মিথ্যা যদি বঙ্কিমের নির্বাচিত মহাভারতেও স্থান পাইয়া থাকে তবে তদ্দ্বারা সেই মহাভারতের প্রামাণিকতা হ্রাস ও সেই মহাভারত-বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা খর্ব হইয়া আসে। সাক্ষী যখন একমাত্র, তখন তাহার সাক্ষ্যের কোনো-এক বিশেষ অংশ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে গেলে সাক্ষ্যের অপরাংশে মিথ্যাসংস্রব না থাকা আবশ্যক।

কিন্তু এত আয়োজন করিয়া অগ্রসর হইতে গেলে সম্ভবত কৃষ্ণচরিত্র-গ্রন্থখানি বাঙালি পাঠকের অদৃষ্টে জুটিত না। সমুচিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সমস্ত মহাভারতের সমূলক অংশ উদ্ধার করা একজন লোকের জীবিতকালে সম্ভব কি না সন্দেহ। অতএব মহাভারতের বিস্তীর্ণ গহন অরণ্যের মধ্যে বঙ্কিম যে এক সংকীর্ণ পথের সূচনা করিয়া দিয়াছেন তাহা আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা, এবং অল্প বিস্ময়ের বিষয় নহে। আমাদের কেবল বক্তব্য এই যে, তাঁহার কার্য পরিসমাপ্ত হয় নাই। বঙ্কিমের প্রতিভা আমাদিগকে যেখানে উপনীত করিয়াছেন সেইখানেই যে আমাদিগকে সন্তুষ্টচিত্তে বসিয়া থাকিতে হইবে তাহা নহে।

তিনি আমাদিগকে অসন্তোষের উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে; সচেষ্টভাবে সত্যের রাজ্য বিস্তার করিতে হইবে। তিনি আমাদের হাতে মুক্তাটি দিয়া যান নাই, দৃষ্টান্তসহকারে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে 'যদি মুক্তা চাও তো সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে'। খুব সম্ভবত আমরা নমস্কার করিয়া বলিব, 'আমাদের মুক্তায় কাজ নাই, আমরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারিব না।'

বঙ্কিম, মেকলে কার্লাইল্ লামার্টিন্ থুকিদিদীস্ প্রভৃতি উদাহরণ দেখাইয়া মহাভারতকে কবিত্বময় ইতিহাস বলিতে চাহেন; আমরা মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া গণ্য করি। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের আদর্শ আমরা ইতিহাস হইতে পাই অথবা কাব্য হইতে পাই, অথবা কাব্য-ইতিহাসের মিশ্রণ হইতে পাই, তাহা লইয়া অধিক তর্ক করিতে চাহি না। ফলত ইতিহাস যে বেদবাক্য তাহা নহে। সকলেই জানেন, একটা উপস্থিত ঘটনা-স্থলেও প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকৃতরূপে গ্রহণ করিতে এবং প্রকৃতরূপে বর্ণনা করিতে অতি অল্প লোকই পারে। খণ্ড খণ্ড বৃত্তান্ত হইতে একটি সমগ্র মানবচরিত্র ও ইতিহাস রচনা করা আরও অল্প লোকের সাধ্যায়ত্ত। সকলেই জানেন, আত্মীয় সম্বন্ধেও আত্মীয়ের ভ্রম হয় এবং বন্ধুকেও বন্ধু অনেক বিষয়ে বিপরীতভাবে বুঝিয়া থাকেন। অসাধারণ লোককে প্রকৃতভাবে জানা আরও কঠিন; দূর হইতে এবং অতীত বৃত্তান্ত হইতে তাঁহার যথার্থ প্রতিকৃতি নির্মাণ বহুল পরিমাণে কাল্পনিক, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রমাণে এবং অনুমানে মিশ্রিত করিয়া একই লোকের এত বিভিন্ন প্রকার মূর্তি গড়িয়া তোলা যায় যে, তাহার মধ্যে কোন্‌টা মূলের অনুরূপ তাহা প্রকৃতিভেদে ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভাবে বিশ্বাস করেন। ইতিহাসমাত্রই যে বহুল পরিমাণে লেখকের অনুমান ও পাঠকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে কবির অনুমান ঐতিহাসিকের অনুমানের অপেক্ষা প্রকৃত

ইতিহাসের অনেক কাছাকাছি যাওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। ফস্টার সাহেব স্ট্র্যাফোর্ডের যে জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন, জনশ্রুতি এই যে, তাহা কবি ব্রাউনিংএর স্বরচিত বলিলেও হয়, কিন্তু উক্ত কবি অনতিকাল পরে স্ট্র্যাফোর্ড্-নামক যে নাটক লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার ইতিহাসের অপেক্ষা অধিকতর সত্য বলিয়া পরে প্রমাণিত হইয়াছে। সেইরূপ, পুরাকালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে-সকল কিম্বদন্তী বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল মহাভারতের কবি কল্পনাবলে তাহাদের অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া তাহাদিগকে যে-একটি সমগ্র চিত্রে প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহা যে ঐতিহাসিকের ইতিহাস অপেক্ষা অল্প সত্য হইবেই এমন কোনো কথা নাই।

তথ্য, যাহাকে ইংরাজিতে fact কহে, সত্য তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি এবং কল্পনা -বলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সত্য কবির প্রতিভাবলে কাব্যেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অতএব এত দীর্ঘকাল পরে মহাভারতের কবিবর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণ লইতে বসা আমরা দুঃসাধ্য এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে বাহুল্য বোধ করি। সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ ফ্রুড সাহেব বলিয়াছেন, 'যথার্থ মহৎ ব্যক্তির অকৃত্রিম এবং স্বাভাবিক মহত্ত্ব গদ্যের আয়ত্তের বাহিরে ; তাহা কেবলমাত্র কবির লেখনী-দ্বারাই বর্ণনসাধ্য। ইহার কারণ যাহাই হউক, ফলত ইহা সত্য। কবিতার এই সঞ্জীবনীশক্তি আছে এবং গদ্যের তাহা নাই, এবং সেই কারণেই কবিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।'

আমরা ফ্রুডের উপরি-উক্ত কথার এই অর্থ বুঝি যে, মহৎব্যক্তির কার্যবিবরণ কেবল তথ্য মাত্র, তাঁহার মহত্ত্বটাই সত্য ; সেই সত্যটি পাঠকের মনে উদিত করিয়া দিতে ঐতিহাসিকের গবেষণা অপেক্ষা

কবিপ্রতিভার আবশ্যকতা অধিক।

সে হিসাবে দেখিতে গেলে মহাভারতের কবি-বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের প্রত্যেক তথ্যটি প্রকৃত না হইতে পারে, কৃষ্ণের মুখে যত কথা বসানো হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতি যত কার্যকলাপের আরোপ হইয়াছে তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃত্তান্তটি প্রামাণিক না হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের যে মাহাত্ম্য তিনি পাঠকদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন তাহাই সর্বাপেক্ষা মহামূল্য সত্য। কৃষ্ণের যদি ইতিহাস থাকিত তবে সম্ভবত তাহাতে এমন সহস্র ঘটনার উল্লেখ থাকিত যাহা কৃষ্ণকর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার কোনো স্থায়ী মূল্য নাই, অর্থাৎ সে-সকল কাজ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব প্রকাশ করে না— এমন-কি শেষ পর্যন্ত সকল কথা জানা সম্ভব নহে বলিয়া তাহার অনেকগুলি কৃষ্ণের যথার্থ স্বভাবের বিরোধী বলিয়াও মনে হইতে পারিত। প্রত্যেক মানুষে অনেক কাজে নিজের যথার্থ প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও থাকে। মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রে নিশ্চয়ই সেই-সকল অনাবশ্যক এবং আকস্মিক তথ্যগুলি বর্জিত হইয়া কেবল প্রকৃত স্বরূপগত সত্যগুলি নির্বাচিত হইয়াছে— এমন-কি, কৃষ্ণ যে কথা বলেন নাই কিন্তু যে কথা কেবল কৃষ্ণই বলিতে পারিতেন সেই কথা কৃষ্ণকে বলাইয়া, কৃষ্ণ যে কাজ করেন নাই কিন্তু যে কাজ কেবল কৃষ্ণই করিতে পারিতেন সেই কাজ কৃষ্ণকে করাইয়া, কবি বাস্তবিক কৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহার কৃষ্ণকে অধিকতর সত্য করিয়া তুলিয়াছেন। অর্থাৎ বাস্তব কৃষ্ণে স্বভাবতই অকৃষ্ণ যাহা ছিল তাহা দূরে রাখিয়া এবং বাস্তব কৃষ্ণ নিজের চরিত্রগুণে কবির মনে যে আদর্শের উদয় করিয়া দিয়াছেন পরন্তু নানা বাহ্য কারণে যাহা কার্যে সর্বত্র ধারাবাহিক পরিস্ফুটভাবে ও নির্বিরোধে প্রকাশ হইতে পারে নাই সেই আদর্শকে সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুট করিয়া, কবি বাস্তবিকই ইতিহাস হইতে সত্যতম নিত্যতম কৃষ্ণকে উদ্ধার করিয়া লইয়াছেন।

অতএব, বঙ্কিম যখন কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য বাঙালি পাঠকদিগের মনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন তখন কবির কাব্য হইতে তাহা উদ্‌ধৃত করিয়া লওয়াই তাঁহার উপযুক্ত কার্য হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মহাভারত নানা কালের নানা লোকের রচনার মধ্যে চাপা পড়িয়াছে ; কবির মূল আদর্শটি বাহির করা সহজ ব্যাপার নহে। সমস্ত জঞ্জাল দূর করিতে পারিলে, কেবল কৃষ্ণ নহে, ভীষ্ম কর্ণ অর্জুন দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলেই উজ্জ্বলতর সম্পূর্ণতর আকারে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন। মহাভারতের আদিকবির মূল রচনাটি উদ্ধার করা হইলে মানবজাতির একটি পরমতম লাভ হইবে।

কিন্তু, মহাভারতের আদিকবির আদর্শ কৃষ্ণচরিত্র কিরূপ ছিল বঙ্কিম নিজের আদর্শ অনুসারে তাহা আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন কি না তাহা নিঃসংশয়ে বলিবার পূর্বে অষ্টাদশপর্ব-পারাবার হইতে মূল মহাভারতটিকে মন্থন করিয়া লওয়া আবশ্যক। আপাতত কেবল একটি বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

বঙ্কিম যাঁহাকে মহাভারতের প্রথম স্তরের কবি বলেন তিনি কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন না, এ কথা বঙ্কিম স্বীকার করিয়াছেন। এমন-কি, এই তথ্যটি তাঁহার মতে প্রথম স্তর নির্ণয় করিবার একটি প্রধান উপায়।

কিন্তু বঙ্কিম কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন। এই মহৎ প্রভেদ-বশত মহাভারত-গত প্রথম স্তরের কবির আদর্শ কৃষ্ণচরিত্র তাঁহার পক্ষে নির্বাচন করিয়া লওয়া সহজ ছিল না। তিনি যে কৃষ্ণের অন্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন সে কৃষ্ণ তাঁহার নিজের মনের আকাঙ্ক্ষাজাত'। সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্যক্‌ অনুশীলনে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত একটি আদর্শ তিনি ব্যাকুলচিত্তে সন্ধান করিতেছিলেন, তাঁহার ধর্মতত্ত্বে যাহাকে তত্ত্বভাবে পাইয়াছিলেন ইতিহাসে তাহাকেই সজীব শরীরীভাবে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নিঃসন্দেহ

তাঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ছিল। মনের সে অবস্থায় অন্য কোনো কবির আদর্শকে অবিকলভাবে উদ্ধার করা মনুষ্যের পক্ষে সহজ নহে।

উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, বঙ্কিম যদিও কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তথাপি তিনি বারম্বার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর যখন অবতাররূপে নরলোকে অবতীর্ণ হন তখন তিনি সম্পূর্ণ মানুষ-ভাবেই প্রকাশ পাইতে থাকেন, কোনোপ্রকার অলৌকিক কাণ্ড-দ্বারা আপনাকে দেবতা বলিয়া প্রচার করেন না। অতএব বঙ্কিম দেবতা-কৃষ্ণকে নহে, মানুষ-কৃষ্ণকেই মহাভারত হইতে আবিষ্কার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে মানুষকে বঙ্কিম খুঁজিতেছিলেন তাহার কোথাও কোনো অসম্পূর্ণতা নাই, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত। অর্থাৎ সে একটি মূর্তিমান থিওরি। কিন্তু সম্ভবত মহাভারতকারের কৃষ্ণ দেবতা নহেন, অনুশীলনপ্রাপ্ত চিত্তবৃত্তি নহেন, তিনি কৃষ্ণ।

মহাভারতকার এমন একটি মানুষের সৃষ্টি করেন নাই যিনি মনুষ্য-আকার-ধারী তত্ত্বকথা বা নীতিসূত্র মাত্র। সেই তাঁহার অত্যুচ্চ কবিপ্রতিভার পরিচায়ক। তিনি তাঁহার বড়ো বড়ো বীরদিগকেও অনেক সময় এমন-সকল অযোগ্য কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন যাহা ছোটো কবিদের সাহসে কুলাইত না। ছোটো কবিদের সৃজনশক্তি নাই, নির্মাণশক্তি আছে; তাহারা যাহা গড়ে তাহার আদ্যোপান্ত নিয়ম-অনুসারে গড়ে— কোথাও তাহার মধ্যে ব্যতিক্রম বা আত্মবিরোধ রাখিতে পারে না। প্রকৃত বড়ো জিনিসের অসম্পূর্ণতাও তাহার বড়োত্ব সূচনা করে; প্রকৃতি একটা পর্বতকে নিখুঁত মণ্ডলাকার করিবার আবশ্যক বোধ করে না— তাহার সমস্ত অযত্ন অবহেলা লইয়াও সে অভ্রভেদী রাজগৌরবগর্বিত। সে আপন অপূর্ণতাগুলি এমন অনায়াসে বহন করিতে পারে যে, তাহার অপূর্ণতার দ্বারা তাহার প্রকাণ্ড সম্পূর্ণতার পরিমাপ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বস্তুতে সামান্য অপূর্ণতা মারাত্মক— তাহার

প্রতি দৃষ্টি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইলে তাহাকে নিখুঁত করাই আবশ্যক হইয়া পড়ে।

মহাভারতকার কবি যে একটি বীরসমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একটি সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু ক্ষুদ্র সুসংগতি নাই। খুব সম্ভব আধুনিক খ্যাত অখ্যাত অনেক 'আর্য' বাঙালি লেখকই সরলা বিমলা দামিনী যামিনী -নামধেয়া এমন-সকল সতী চরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন যাঁহারা আদ্যোপান্তসুসংগত অপূর্ব নৈতিক গুণে দ্রৌপদীকে পদে পদে পরাভূত করিতে পারেন, কিন্তু তথাপি মহাভারতের দ্রৌপদী তাঁহার সমস্ত অপূর্ণতা অসংকোচে বক্ষে বহন করিয়া এই-সমস্ত নব্য-বল্মীক-রচিত ক্ষুদ্র নীতিস্তূপগুলির বহু ঊর্ধ্বে উদার আদিম অপর্যাপ্ত প্রবল মাহাত্ম্যে নিত্যকাল বিরাজ করিতে থাকিবেন। মহাভারতের কর্ণ সভাপর্বে পাণ্ডবদের প্রতি যে-সকল হীনতাচরণ করিয়াছেন আমাদের নাটক-নভেলের দীনেশ রমেশ গণেশ ধনেশ -বর্গ কখনোই তাহা করেন না, তাঁহারা সময়ে-অসময়ে স্থানে-অস্থানে অনায়াসেই আত্মবিসর্জন করিয়া থাকেন, তথাপি মহাভারতের কবি বিনা চেষ্টায় কর্ণকে যে অমরলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন এই দীনেশ রমেশ গণেশ ধনেশ -বর্গ সমালোচকপ্রদত্ত সমস্ত ফার্স্ট্‌ক্লাশ-টিকিট এবং নৈতিক পাথেয় লইয়াও তাহার নিম্নতম সোপান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে কি না সন্দেহ।

সেই কারণেই বলিতেছিলাম, প্রথম স্তরের মহাভারতকার কবি যদি কৃষ্ণকে দেবতা বলিয়া মানিতেন না ইহা সত্য হয়, তবে তিনি যে তাঁহাকে নীতিশিক্ষার অখণ্ড উদাহরণ-স্বরূপ গড়িয়াছিলেন ইহা আমাদের নিকট সম্ভবপর বোধ হয় না। বঙ্কিম মহাভারতের প্রথমস্তর-রচয়িতাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, অনেক স্থলে সেই শ্রেষ্ঠত্বের দোহাই দিয়া তিনি কৃষ্ণচরিত্র হইতে সমস্ত অসংগতি অসম্পূর্ণতা বাদ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলিতেছি, সেই শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ যে সংগতি তাহা নহে। এ

পর্যন্ত হ্যাম্‌লেট-চরিত্রের সংগতি কেহ সন্তোষজনকরূপে আবিষ্কার করিতে পারে নাই, কিন্তু কাব্যজগতের মধ্যে হ্যাম্‌লেট যে একটি পরম স্বাভাবিক সৃষ্টি সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে নাই।

অতএব, বঙ্কিম মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র হইতে সমস্ত মন্দ অংশ বাদ দিয়া যে আদিম মহাভারতকারের আদর্শ কৃষ্ণকেই আবিষ্কার করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।

এক্ষণে কথা এই যে, মহাভারতকারের আদর্শ নাই হইল, বঙ্কিমের আদর্শ যদি যথার্থ মহৎ হয় তবে সেও বঙ্গীয় পাঠকদের পক্ষে পরম লাভ বলিতে হইবে।

বঙ্কিমের আদর্শ যে মহৎ এবং কৃষ্ণচরিত্র যে বঙ্গসাহিত্যের পরম লাভ সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই।

কিন্তু সেইজন্যই কৃষ্ণচরিত্র পাঠ করিতে সর্বদাই মনে এই খেদ উপস্থিত হয় যে, সাহিত্যে যে প্রণালীতে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় বঙ্কিম সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই।

ফ্রুড যে বলিয়াছেন মহৎ লোকের মাহাত্ম্য ইতিহাস যথার্থরূপে প্রকাশ করিতে পারে না, কাব্য পারে, সে কথা সত্য। কারণ, মাহাত্ম্য পদার্থটি পাঠকের মনে অখণ্ডভাবে সজীবভাবে সঞ্চার করিয়া দিবার জিনিস। তাহা তর্কদ্বারা যুক্তিদ্বারা ক্রমশ খণ্ড খণ্ড আকারে মনের মধ্যে কিয়দংশে প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু তর্ক যুক্তি তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে সর্বাংশে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে না।

বঙ্কিম গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতেই তরবারি হস্তে সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন; কোথাও শান্তভাবে তাঁহার কৃষ্ণের সমগ্র মূর্তি আমাদের সম্মুখে একত্র ধরিবার অবসর পান নাই।

সেজন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়াও যায় না। কারণ, ভক্তসম্প্রদায়ের বাহিরে, এমন-কি ভিতরেও, কৃষ্ণচরিত্র যেরূপ কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত ছিল

তাহাতে প্রথমত সেই পূর্বসংস্কার ঘুচাইবার জন্য তাঁহাকে বিপুল প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। যেখানে তাঁহার দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে সেখানকার জঙ্গল সাফ করিবার জন্য তাঁহাকে কুঠার ধারণ করিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রকৃত কৃষ্ণ যে অনেক বিভিন্ন, বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র হইতে তাহা আমরা শিক্ষা করিয়াছি।

কিন্তু বঙ্কিম এই গ্রন্থে অনাবশ্যক যে-সকল কলহের অবতারণা করিয়াছেন আমাদের নিকট তাহা অত্যন্ত পীড়াজনক বোধ হইয়াছে। কারণ, যে আদর্শ হৃদয়ে স্থির রাখিয়া বঙ্কিম এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন সেই আদর্শের দ্বারাই সমস্ত ভাষা এবং ভাব অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলে তবেই সে আদর্শের মর্যাদা রক্ষা হয়। বঙ্কিম যদি তুচ্ছ বিরোধ এবং অনুদার সমালোচনার অবতারণা-পূর্বক চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন তবে সেই চাঞ্চল্য তাঁহার আদর্শের নিত্যনির্বিকারতা দূর করিয়া ফেলে। অনেক ঝগড়া আছে যাহা সাপ্তাহিক পত্রের বাদপ্রতিবাদেই শোভা পায়, যাহা কোনো চিরস্মরণীয় চিরস্থায়ী গ্রন্থে স্থান পাইবার একেবারে অযোগ্য।

'পাশ্চাত্য মূর্খ' অর্থাৎ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি লেখক অজস্র অবজ্ঞা বর্ষণ করিয়াছেন। প্রথমত, সে কাজটাই গর্হিত; দ্বিতীয়ত, এমন গ্রন্থে সেটা অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে। মান্যজনের সমক্ষে অন্য কাহারও প্রতি অযথা দুর্ব্যবহার কেবল দুর্ব্যবহার মাত্র নহে, তাহা মান্য-ব্যক্তির প্রতিও অশিষ্টতা। বঙ্কিম যাঁহাকে মানবশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন, যিনি একাধারে ক্ষমা ও শৌর্যের আধার, যিনি সক্ষম হইয়াও অকারণে এমন-কি সকারণে অস্ত্র ধারণ করিতে অনেক সময়েই বিরত হইয়াছেন— তাঁহারই চরিত্র-প্রতিষ্ঠা-স্থলে তাঁহারই আদর্শের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া মতভেদ-উপলক্ষে চপলতা প্রকাশ করা আদর্শের অবমাননা। কেবল

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি নহে, সাধারণত য়ুরোপীয় জাতির প্রতিই লেখক স্থানে অস্থানে তীব্র বৈরিতা প্রকাশ করিয়াছেন। দুই-একটা দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করি।—

শিশুপালের গালি 'শুনিয়া ক্ষমাগুণের পরমাধার পরমযোগী আদর্শ-পুরুষ কোনো উত্তর করিলেন না। কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল যে, তদ্দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম— পরবর্তী ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখনো যে এরূপ পরুষবচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন এমন দেখা যায় না। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, য়ুরোপীয়দের মতো ডাকিয়া বলিলেন না, শিশুপাল, ক্ষমা বড়ো ধর্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম। নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন।'

শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমাগুণের বর্ণনাস্থলে অকারণে য়ুরোপীয়দের প্রতি একটা অন্যায় খোঁচা দেওয়া যে কেবল অনাবশ্যক হইয়াছে তাহা নহে, ইহাতে মূল উদ্দেশ্যটি পর্যন্ত নষ্ট হইয়াছে। পাঠকদের চিত্তকে যেরূপভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিলে তাহারা কৃষ্ণের ক্ষমাশক্তির মাহাত্ম্য হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিত তাহা ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। কৃষ্ণচরিত্রের ন্যায় গ্রন্থ কেবল আধুনিক হিন্দুদের জন্য লিখিত হওয়া উচিত নহে, তাহা সর্বকালের সর্বজাতির জন্যই রচিত হওয়া কর্তব্য। পাঠকেরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন এই অংশ-পাঠকালে একজন য়ুরোপীয় পাঠকের মনে কিরূপ বিদ্রোহীভাবের উদয় হওয়া সম্ভব। বিশেষত ক্ষমা করিবার সময় ক্ষমাধর্মের মহিমাকীর্তন যে য়ুরোপীয়দের জাতীয় প্রকৃতি এরূপ সাধারণ কথা লেখক কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন বলা কঠিন। আমাদের শাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ ভূরি ভূরি আছে— যখন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের গাভী বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন এবং নন্দিনী অতিশয় তাড়িত হইয়া আর্তরবে বশিষ্ঠের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তখন বশিষ্ঠ কহিলেন, 'হে ভদ্রে নন্দিনী, তুমি পুনঃপুনঃ রব করিতেছ, তাহা আমি শুনিতেছি;

কিন্তু হে ভদ্রে, যখন রাজা বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্বক হরণ করিতেছেন তখন আমি কী করিব! যেহেতু আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ।' পুনশ্চ নন্দিনী তাঁহার নিকট কাতরতা প্রকাশ করিলে তিনি কহিলেন, 'ক্ষত্রিয়ের বল তেজ এবং ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা ; অতএব আমি ক্ষমাগুণে আকৃষ্ট হইতেছি।'

'ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে ; কিন্তু উহা দুঃখের আকর ; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।' —শ্রীকৃষ্ণের এই মহদুক্তি উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিম বলিতেছেন, 'হিন্দু পুরাণেতিহাসে এমন কথা থাকিতে আমরা কিনা মেম-সাহেবদের লেখা নবেল পড়িয়া দিন কাটাই, নাহয় সভা করিয়া পাঁচজনে জুটিয়া পাখির মতো কিচির-মিচির করি।'

ক্ষণে ক্ষণে লেখকের এরূপ ধৈর্যচ্যুতি কৃষ্ণচরিত্রের ন্যায় গ্রন্থে অতিশয় অযোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষায় ভাবে ও ভঙ্গীতে সর্বত্রই একটি গাম্ভীর্য সৌন্দর্য ও ঔদার্য রক্ষা না করাতে বর্ণনীয় আদর্শচরিত্রের উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়াছে।

বঙ্কিম সামান্য উপলক্ষ্যমাত্রেই য়ুরোপীয়দের সহিত, পাঠকদের সহিত এবং ভাগ্যহীন ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত কলহ করিয়াছেন। সেই কলহের ভাবটাই এ গ্রন্থে অসংগত হইয়াছে ; তাহা ছাড়া প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিস্তর অবান্তর তর্কের উত্থাপন করিয়া পাঠকের মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রথমত, যখন তিনি কৃষ্ণকে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন তখন ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্ভব কি না এ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া কেবল পাঠকের মনে একটা তর্ক উঠাইয়াছেন, অথচ তাহার ভালোরূপ মীমাংসা করেন নাই। নিরাকার ঈশ্বর আকার ধারণ করিবেন কী করিয়া, এরূপ আপত্তি যাঁহারা করেন বঙ্কিম তাঁহাদিগকে এই উত্তর দিয়াছেন যে, যিনি সর্বশক্তিমান তিনি আকার

গ্রহণ করিতে পারেন না ইহা অসম্ভব। যাঁহারা আপত্তি করেন যে যিনি সর্বশক্তিমান তাঁহার দেহ ধারণ করিবার প্রয়োজন কি, তিনি তো ইচ্ছামাত্রেই রাবণ কুম্ভকর্ণ অথবা কংস শিশুপাল বধ করিতে পারেন, তাঁহাদের কথার উত্তরে বঙ্কিম বলেন যে, রাবণ অথবা শিশুপাল বধ করিবার জন্যই যে ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন তাহা নহে, মনুষ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই তাঁহার অবতার হইবার উদ্দেশ্য। তিনি দেবতার ভাবে যদি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করেন তবে তাহাতে মানুষের কোনো শিক্ষা হয় না; পরন্তু তিনি যদি মনুষ্য হইয়া দেখাইয়া দেন মনুষ্যের দ্বারা কতদূর সম্ভব তবেই তাহা আমাদের স্থায়ী কল্যাণের কারণ হয়। এক্ষণে তৃতীয় আপত্তি এই উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন এবং মনুষ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয় তবে তিনি কি আদর্শরূপী মনুষ্যকে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন না— তাঁহার কি নিজেই মনুষ্য হইয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই? এইখানেই কি তাঁহার শক্তির সীমা?— বঙ্কিম এই আপত্তি উত্থাপনও করেন নাই, এই আপত্তির উত্তরও দেন নাই।

পরন্তু, সমস্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্যের সহিত এই তর্কের কিঞ্চিৎ যোগ আছে। বঙ্কিম নানা স্থলেই স্বীকার করিয়াছেন যে মানুষের আদর্শ যেমন কার্যকারী এমন দেবতার আদর্শ নহে। কারণ, সর্বশক্তিমানের অনুকরণে আমাদের সহজেই উৎসাহ না হইতে পারে। যাহা মানুষে সাধন করিয়াছে তাহা আমরাও সাধন করিতে পারি, এই বিশ্বাস এবং আশা অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং স্বাভাবিক। অতএব কৃষ্ণকে দেবতা প্রমাণ করিতে গিয়া বঙ্কিম তাঁহার মানব-আদর্শের মূল্য হ্রাস করিয়া দিতেছেন। কারণ, ঈশ্বরের পক্ষে সকলই যখন অনায়াসে সম্ভব তখন কৃষ্ণচরিত্রে বিশেষরূপে বিস্ময় অনুভব করিবার কোনো কারণ দেখা যায় না।

বঙ্কিম এই গ্রন্থের অনেক স্থলেই যে-সকল সামাজিক তর্ক উত্থাপন

করিয়াছেন তাহাতে গ্রন্থের বিষয়টি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে মাত্র, আর কোনো ফল হয় নাই। 'কৃষ্ণের বহুবিবাহ'-শীর্ষক অধ্যায়ে রুক্মিণী ব্যতীত কৃষ্ণের অন্য স্ত্রী ছিল না ইহাই প্রমাণ করিয়া লেখক সর্বশেষে তর্ক তুলিয়াছেন যে, পুরুষের বহুবিবাহ সকল অবস্থাতেই অধর্ম এ কথা ঠিক নহে। তিনি বলিয়াছেন, 'সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম। কিন্তু সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পত্নী কুষ্ঠগ্রস্ত বা এরূপ রুগ্‌ণ যে সে কোনোমতেই সংসারধর্মের সহায়তা করিতে পারে না, তাহার যে দারান্তরপরিগ্রহ পাপ এমন কথা আমি বুঝিতে পারি না। যাহার স্ত্রী ধর্মভ্রষ্টা কুলকলঙ্কিনী সে যে কেন আদালতে না গিয়া দ্বিতীয়-বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিবে না তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না।···যাহার উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন, কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা, সে যে কেন দারান্তর গ্রহণ করিবে না তাহা বুঝিতে পারি না।··· যদি য়ুরোপের এ কুশিক্ষা না হইত তাহা হইলে বোনাপার্টিকে জসেফাইনের বর্জন রূপ অতি ঘোর নারকীপাতকে পতিত হইতে হইত না; অষ্টম হেন্‌রিকে কথায় কথায় পত্নীহত্যা করিতে হইত না। য়ুরোপে আজি কালি সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে এই কারণে অনেক পত্নী-হত্যা হইতেছে। আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই বিলাতি তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দোষশূন্য, ঊর্ধ্বাধঃ চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ। আমার বিশ্বাস, আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি বিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখিতে পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহতত্ত্ব একটা কথা।'

কৃষ্ণ যখন একাধিক বিবাহ করেন নাই তখন বিবাহ সম্বন্ধীয় এই তর্ক নিতান্তই অনাবশ্যক; তাহা ছাড়া তর্কটারই বা কী মীমাংসা হইল? প্রথম স্থির হইল যাহার স্ত্রী রুগ্‌ণ অথবা ভ্রষ্টা অথবা বন্ধ্যা সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু য়ুরোপে রুগ্‌ণা ভ্রষ্টা এবং বন্ধ্যার স্বামী

সহজে দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে না বলিয়াই যে সেখানকার সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে এত পত্নীহত্যা হইতেছে তাহা নহে, অনেক সময় পত্নীর প্রতি বিরাগ ও অন্যের প্রতি অনুরাগ -বশত হত্যা-ঘটনা অধিকতর সম্ভবপর। যদি সে হত্যা নিবারণ করিতে হয় তবে অন্য স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ-সঞ্চারকেও দ্বিতীয় স্ত্রী-গ্রহণের ধর্মসংগত বিধান বলিয়া স্থির করিতে হয়। তাহা হইলে 'সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম' এ কথাটার এই তাৎপর্য দাঁড়ায় যে, 'যখন দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে যাইবে তখন যেন একটা কোনো কারণ থাকে ; কাজটা যেন অকারণে না হয়। অর্থাৎ যদি তোমার স্ত্রী রুগ্‌ণ অক্ষম হয় তবে তুমি বিবাহ করিতে পার, অথবা যদি অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা বোধ হয় তাহা হইলেও তুমি বিবাহ করিতে পার— কারণ, সেইরূপ ইচ্ছার বাধা পাইয়া ইংলণ্ডের অষ্টম হেন্‌রি পত্নীহত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনো কারণ না থাকিলে বিবাহ করিয়ো না।' জিজ্ঞাস্য এই যে, স্বামীকে যে যুক্তি অনুসারে যে-সকল স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী করা হইল ঠিক সেই যুক্তি অনুসারে অনুরূপ স্থলে স্ত্রীর প্রতি অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা যায় কি না এবং আমাদের সমাজে স্ত্রীর সেই-সকল স্বাধীন ক্ষমতা না থাকাতে অনেক স্ত্রী 'অতি ঘোর নারকীপাতকে পতিত' হয় কি না।

ইহার অনতিপরেই সুভদ্রাহরণ কার্যটা যে বিশেষ দোষের হয় নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিতে গিয়া লেখক 'মালাবরী'-নামক এক পার্শি— সম্ভবত যাঁহার খ্যাতিপুষ্প বর্তমান কালের গুটিকয়েক সংবাদপত্রপুটের মধ্যেই কীটের দ্বারা জীর্ণ হইতে থাকিবে— তাঁহার প্রতি একটা খোঁচা দিয়া আর-একটা সামাজিক তর্ক তুলিয়াছেন। সে তর্কটারও মীমাংসা কিছুমাত্র সন্তোষজনক হয় নাই, অথচ লেখক অধীরভাবে অসহিষ্ণু ভাষায় অনেকের সঙ্গে অনর্থক একটা কলহ করিয়াছেন।

বঙ্কিম যদি কৃষ্ণকে দেবতা না মনে করিতেন এবং কৃষ্ণের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার কোনোরূপ থিওরি না থাকিত তাহা হইলে এ-সমস্ত তর্কবিতর্কের কোনো প্রয়োজন থাকিত না, এবং তিনি সর্বত্র সংযম রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন। তাহা হইলে তিনি নিরপেক্ষ নির্বিকার চিত্তে মহাভারতকার কবির আদর্শ কৃষ্ণকে অবিকল ভাবে উদ্ধার করিয়া পাঠকদের সম্মুখে উপনীত করিতেন— এবং পাছে কোনো অবিশ্বাসী সংশয়ী পাঠক তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের কোনো অংশে তিলমাত্র অসম্পূর্ণতা দেখিতে পায় এজন্য আগে-ভাগে তাহাদের প্রতি রোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার গ্রন্থ হইতে উচ্চ সাহিত্যের লক্ষণগত অচঞ্চল শান্তি দূর করিয়া দিতেন না।

যেমন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের উপরে নেপথ্যবিধান করিতে আরম্ভ করিলে অভিনয়ের রসভঙ্গ হয়, কাব্যসৌন্দর্য সমগ্রভাবে শ্রোতৃবর্গের মনের মধ্যে মুদ্রিত হয় না, সেইরূপ বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রে পদে পদে তর্ক যুক্তি বিচার উপস্থিত হইয়া আসল কৃষ্ণচরিত্রটিকে পাঠকের হৃদয়ে অখণ্ডভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা দিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম বলিতে পারেন, 'কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থটি স্টেজ নহে, উহা নেপথ্য; স্টেজ-ম্যানেজার আমি নানা বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া নানা স্থান হইতে নানা সাজসজ্জা-আনয়ন-পূর্বক কৃষ্ণকে নরোত্তমবেশে সাজাইয়া দিলাম— এখন কোনো কবি আসিয়া যবনিকা উত্তোলন করিয়া দিন, অভিনয় আরম্ভ করুন, সর্বসাধারণের মনোহরণ করিতে থাকুন? তাঁহাকে শ্রমসাধ্য চিন্তাসাধ্য বিচারসাধ্য কাজ কিছুই করিতে হইবে না।'

মাঘ, ফাল্গুন ১৩০১

রাজসিংহ

রাজসিংহ প্রথম হইতে উল্টাইয়া গেলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয় যে, কোনো ঘটনা কোনো পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না, সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে, এবং সেই অগ্রসরগতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এই অনিবার্য অগ্রসরগতি সঞ্চার করিবার জন্য বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক ভার দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। অনাবশ্যক কেন, অনেক আবশ্যক ভারও বর্জন করিয়াছেন, কেবল অত্যাবশ্যকটুকু রাখিয়াছেন মাত্র।

কোনো ভীরু লেখকের হাতে পড়িলে ইহার মধ্যে অনেকগুলি পরিচ্ছেদে বড়ো বড়ো কৈফিয়ত বসিত। জবাবদিহির ভয়ে তাহাকে অনেক কথা বাড়াইয়া লিখিতে হইত। সম্রাটের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাদশাহজাদীর সহিত মোবারকের প্রণয়ব্যাপার, তাহা লইয়া দুঃসাহসিকা আতরওয়ালী দরিয়ার প্রগল্‌ভতা, চঞ্চলকুমারীর নিকট আপন পরামর্শ ও পাঞ্জা -সমেত যোধপুরী বেগমের দূতীপ্রেরণ, সেনাপতির নিকট নৃত্যকৌশল দেখাইয়া দরিয়ার পুরুষবেশী অশ্বারোহী সৈনিক সাজিবার সম্মতি গ্রহণ— এ-সমস্ত যে একেবারেই সম্ভবাতীত তাহা না হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের সত্যতার বিশিষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। বঙ্কিমবাবু এক-একটি ছোটো ছোটো পরিচ্ছেদে ইহাদিগকে এমন অবলীলাক্রমে অসংকোচে ব্যক্ত করিয়া গেছেন যে কেহ তাঁহাকে সন্দেহ করিতে সাহস করে না। ভীতু লেখকের কলম এই-সকল জায়গায় ইতস্তত করিত, অনেক কথা বলিত এবং অনেক কথা বলিতে গিয়াই পাঠকের সন্দেহ আরো বেশি করিয়া আকর্ষণ করিত।

বঙ্কিমবাবু একে তো কোথাও কোনরূপ জবাবদিহি করেন নাই, তাহার উপরে আবার মাঝে মাঝে নির্দোষ পাঠকদিগকেও ধমক দিতে ছাড়েন নাই। মানিকলাল যখন পথের মধ্যে হঠাৎ অপরিচিতা নির্মলকুমারীকে তাহার সহিত এক ঘোড়ায় উঠিয়া বসিতে বলিল এবং নির্মল যখন তাহার নিকট বিবাহের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে মানিকলালের অনুরোধ রক্ষা করিল, তখন লেখক কোথায় তাঁহার স্বরচিত পাত্রগুলির এইরূপ অপূর্ব ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইবেন, তাহা না হইয়া উল্‌টিয়া তিনি বিস্মিত পাঠকবর্গের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন, 'বোধ হয় কোর্ট্‌শিপ্‌টা পাঠকের বড়ো ভালো লাগিল না। আমি কী করিব? ভালোবাসাবাসির কথা একটাও নাই, বহুকালসঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই— হে প্রাণ! হে প্রাণাধিকা! সে-সব কিছুই নাই— ধিক্‌!'

এই গ্রন্থবর্ণিত পাত্রগণের চরিত্রের, বিশেষত স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বড়ো একটা দ্রুততা আছে। তাহারা বড়ো বড়ো সাহসের এবং নৈপুণ্যের কাজ করে, অথচ তৎপূর্বে যথেষ্ট ইতস্তত অথবা চিন্তা করে না। সুন্দরী বিদ্যুৎরেখার মতো এক নিমেষে মেঘাবরোধ ছিন্ন করিয়া লক্ষ্যের উপর গিয়া পড়ে, কোনো প্রস্তরভিত্তি সেই প্রলয়গতিকে বাধা দিতে পারে না।

স্ত্রীলোক যখন কাজ করে তখন এমনি করিয়াই কাজ করে; তাহার সমগ্র মনপ্রাণ লইয়া, বিবেচনা চিন্তা বিসর্জন দিয়া, একেবারে অব্যবহিত ভাবে উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে হৃদয়বৃত্তি প্রবল হইয়া তাহার প্রাত্যহিক গৃহকর্মসীমার বাহিরে তাহাকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিয়া আনে পাঠককে পূর্ব হইতে তাহার একটা পরিচয়, একটু সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। বঙ্কিমবাবু তাহা পুরাপুরি দেন নাই।

সেইজন্য রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া

গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয় এই উপন্যাসের
লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা শঙ্কা
সংশয় -ভারে ভারাক্রান্ত, কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই দ্বিধাপরায়ণ মনের বোঝাটা
বহিয়া বেড়াইতে হয়— কিন্তু রাজসিংহ-জগতে অধিকাংশ লোকের যেন
আপনার ভার নাই।

যাহারা আজকালকার ইংরাজি নভেল বেশি পড়ে তাহাদের কাছে
এই লঘুতা বড়ো বিস্ময়জনক। আধুনিক ইংরাজি নভেলে পদে পদে
বিশ্লেষণ— একটা সামান্যতম কার্যের সহিত তাহার দূরতম কারণপরম্পরা
গাঁথিয়া দিয়া সেটাকে বৃহদাকার করিয়া তোলা হয়। ব্যাপারটা হয়তো
ছোটো, কিন্তু তাহার নথিটা বড়ো বিপর্যয়। আজকালকার নভেলিস্ট্‌রা
কিছুই বাদ দিতে চান না, তাঁহাদের কাছে সকলই গুরুতর। এইজন্য
উপন্যাসে সংসারের ওজন ভয়ংকর বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের কথা
জানি না, কিন্তু আমাদের মতো পাঠককে তাহাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করে।

এইজন্য আধুনিক উপন্যাস আরম্ভ করিতে ভয় হয়। মনে হয়
কর্মক্লান্ত মানবহৃদয়ের পক্ষে বাস্তবজগতের চিন্তাভার অনেক সময়
যথেষ্টর অপেক্ষা বেশি হইয়া পড়ে, আবার যদি সাহিত্যও নির্দয় হয় তবে
আর পলায়নের পথ থাকে না। সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই,
কিন্তু জগতের ভার চাহি না।

কিন্তু সত্যকে সম্যক্‌ প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে
ভারের আবশ্যক, সেটুকু ভারে কেবল সত্য ভালোরূপ অনুভবগম্য হইয়া
হৃদয়ের আনন্দ উৎপাদন করে; কল্পনাজগৎ প্রত্যক্ষবৎ দৃঢ় ও স্পর্শযোগ্য
ও চিরস্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।

বঙ্কিমবাবু রাজসিংহে সেই আবশ্যক ভারেরও কিয়দংশ যেন বাদ
দিয়াছেন বোধ হয়। ভারে যেটুকু কম পড়িয়াছে গতির দ্বারায় তাহা
পূরণ করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রত্যেক অংশ অসন্দিগ্ধরূপে সম্ভবপর

ও প্রশ্নসহ করিয়া তুলেন নাই, কিন্তু সমস্তটার উপর দিয়া এমন দ্রুত অবলীলাভঙ্গীতে চলিয়া গিয়াছেন যে প্রশ্ন করিবার আবশ্যক হয় নাই। যেন রেলপথের মাঝে মাঝে এমন এক-আধটা ব্রিজ আছে যাহা পূরা মজবুত বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু চালক তাহার উপর দিয়া এমন দ্রুত গাড়ি লইয়া চলে যে ব্রিজ ভাঙিয়া পড়িবার অবসর পায় না।

এমন হইবার কারণও স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। যখন বৃহৎ সৈন্যদল যুদ্ধ করিতে চলে তখন তাহারা সমস্ত ঘরকন্না কাঁধে করিয়া লইয়া চলিতে পারে না। বিস্তর আবশ্যক দ্রব্যের মায়াও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হয়। চলৎশক্তির বাধা তাহাদের পক্ষে মারাত্মক। গৃহস্থ মানুষের পক্ষে উপকরণের প্রাচুর্য এবং ভারবাহুল্য শোভা পায়।

রাজসিংহের গল্পটা সৈন্যদলের চলার মতো ; ঘটনাগুলা বিচিত্র ব্যূহ রচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও সমান বেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখদুঃখের খাতিরে কোথাও বেশিক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। রাজসিংহের সহিত চঞ্চলকুমারীর প্রণয়-ব্যাপারটা তেমন ঘনাইয়া উঠে নাই বলিয়া কোনো কোনো পাঠক এবং সম্ভবত বহুসংখ্যক পাঠিকা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বঙ্কিমবাবু বড়ো একটি দুর্লভ অবসর পাইয়াছিলেন, এই সুযোগে কন্দর্পের পঞ্চশরে এবং করুণরসের বরুণবাণে দিগ্‌বিদিক সমাকুল করিয়া তুলিতে পারিতেন।

কিন্তু তাহার সময় ছিল না। ইতিহাসের সমস্ত প্রবাহ তখন একটি সংকীর্ণ সন্ধিপথে বজ্রস্তনিত রবে ফেনাইয়া চলিতেছে ; তাহারই উপর দিয়া 'সামাল্ সামাল্ তরী'। তখন রহিয়া-বসিয়া ইনিয়া-বিনিয়া প্রেমাভিনয় করিবার সময় নহে।

তখনকার যে প্রেম সে অত্যন্ত বাহুল্যবর্জিত, সংক্ষিপ্ত, সংহত। সে তো বাসররাত্রের সুখশয্যায় বাসন্তী প্রেম নহে, ঘন বর্ষার কালরাত্রে মৃত্যু

হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দোলা দিয়াছে— মান-অভিমান লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়া ত্রস্ত নায়িকা চকিতবাহুপাশে নায়ককে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এখন সুদীর্ঘ সুমধুর ভূমিকার সময় নাই।

এই অকস্মাৎ মৃত্যুর দোলায় সকলেই সজাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং আপনার অন্তরবাসী মহাপ্রাণীর আলিঙ্গন অনুভব করিতেছে। কোথায় ছিল ক্ষুদ্র রূপনগরের অন্তঃপুরপ্রান্তে একটি বালিকা, কালক্রমে সে কোন্ ক্ষুদ্র রাজপুতনৃপতির শত রাজ্ঞীর মধ্যে অন্যতম হইয়া অসম্ভব-চিত্রিত লতার উপরে অসম্ভব-চিত্রিত-পক্ষী-খচিত শ্বেতপ্রস্তররচিত কক্ষ-প্রাচীর-মধ্যে পুরু গালিচায় বসিয়া রঙ্গসঙ্গিনীগণের হাসি-টিট্‌কারি-পরিবৃত হইয়া আলবোলায় তামাকু টানিত। সেই পুষ্পপ্রতিমা সুকুমার সুন্দর বালিকাটুকুর মধ্যে কী এক দুর্বার দুর্ধর্ষ প্রাণশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল, সে আজ বাঁধমুক্ত বন্যার একটি গর্বোদ্ধত প্রবল তরঙ্গের ন্যায় দিল্লির সিংহাসনে গিয়া আঘাত করিল। কোথায় ছিল মোগল রাজ-প্রাসাদের রত্নখচিত রঙমহলে সুন্দরী জেবউন্নিসা— সে সুখের উপর সুখ, বিলাসের উপর বিলাস বিকীর্ণ করিয়া আপনার অন্তরাত্মাকে আরামের পুষ্পরাশির মধ্যে আচ্ছন্ন অচেতন করিয়া রাখিয়াছিল— সে-দিনের সেই মৃত্যুদোলায় হঠাৎ তাহার অন্তরশয্যা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাকে কোন্ মহাপ্রাণী এমন নিষ্ঠুর কঠিন বাহুবেষ্টনে পীড়ন করিয়া ধরিল, সম্রাট্‌দুহিতাকে কে সেই সর্বত্রগামী দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিল যে দুঃখ প্রাসাদের রাজরাজেশ্বরীকেও কুটিরবাসিনী কৃষককন্যার সহিত এক বেদনাশয্যায় শয়ান করাইয়া দেয়! দস্যু মানিকলাল হইল বীর, রূপমুগ্ধ মোবারক মৃত্যুসাগরে আত্মবিসর্জন করিল, গৃহপিঞ্জরের পতঙ্গচপলা দরিয়া সহসা অট্টহাস্যে মুক্তকেশে কালনৃত্যে আসিয়া যোগ দিল। নির্মলকুমারী বিপ্লবের বহিরাকাশে উড়িয়া আসিল, এবং নৃত্যকুশলা

অর্ধরাত্রির এই বিশ্বব্যাপী ভয়ংকর জাগরণের মধ্যে কি মধ্যাহ্নকুলায়-বাসী প্রণয়ের করুণ কপোতকূজন প্রত্যাশা করা যায়?

'রাজসিংহ' দ্বিতীয় 'বিষবৃক্ষ' হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করা সাজে না। বিষবৃক্ষের সুতীব্র সুখদুঃখের পাকগুলা প্রথম হইতেই পাঠকের মনে কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছিল; অবশেষে শেষ কয়টা পাকে হতভাগ্য পাঠকের একেবারে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসে। রাজসিংহের প্রথম দিকের পরিচ্ছেদগুলি মনের উপর সেরূপ রক্তবর্ণ সুগভীর চিহ্ন দিয়া যায় না, তাহার কারণ রাজসিংহ স্বতন্ত্রজাতীয় উপন্যাস।

প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াই মিথ্যা কথা বলিবার আবশ্যক দেখি না। কাল্পনিক পাঠক খাড়া করিয়া তাহাদের প্রতি দোষারোপ করা আমার উচিত হয় না। আসল কথা এই যে, রাজসিংহ পড়া আরম্ভ করিয়া আমারই মনে প্রথম-প্রথম খটকা লাগিতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, বড়োই বেশি তাড়াতাড়ি দেখিতেছি, কাহারো যেন মিষ্টমুখে দুটো ভদ্রতার কথা বলিয়া যাইবারও অবসর নাই। মনের ভিতর এমন আঁচড় দিয়া না গিয়া আর একটু গভীরতররূপে কর্ষণ করিয়া গেলে ভালো হইত। যখন এই-সকল কথা ভাবিতেছিলাম তখন রাজসিংহের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করি নাই।

পর্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্ঝরগুলা পাগলের মতো ছুটিতে আরম্ভ করে তখন মনে হয় তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে, মনে হয় না তাহারা কোনো কাজের। পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। কিছু দূর তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায় নির্ঝরগুলা নদী হইতেছে; ক্রমেই গভীরতর হইয়া, ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া, পর্বত ভাঙিয়া, পথ কাটিয়া, জয়ধ্বনি করিয়া, মহাবলে অগ্রসর হইতেছে। সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।

রাজসিংহেও তাই। তাহার এক-একটি খণ্ড এক-একটি নির্ঝরের মতো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম-প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিমিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি; তাহার পর ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে। তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক বা নদীর স্রোত, কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জন, কতক বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ; উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেবউন্নিসা।

রাজসিংহ চঞ্চলকুমারী নির্মলকুমারী মানিকলাল প্রভৃতি ছোটোবড়ো অনেকে মিলিয়া সেই মেঘদুর্দিন রথযাত্রার দিনে ভারত-ইতিহাসের রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়া দুর্গম বন্ধুর পথে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে লেখকের কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে, তথাপি তাহারা এই ঐতিহাসিক অংশেরই অন্তর্গত। তাহাদের জীবন-ইতিহাসের, তাহাদের সুখদুঃখের স্বতন্ত্র মূল্য নাই, অর্থাৎ এ গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই।

জেবউন্নিসার সহিত ইতিহাসের যোগ আছে বটে, কিন্তু সে যোগ গৌণভাবে। সে যোগটুকু না থাকিলে এ গ্রন্থের মধ্যে তাহার কোনো অধিকার থাকিত না। যোগ আছে, কিন্তু বিপুল ইতিহাস তাহাকে গ্রাস করিয়া আপনার অংশীভূত করিয়া লয় নাই; সে আপনার জীবন-কাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানব-জীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে—বিস্মিত হইয়া দেখো, সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ; কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার সেই মর্মান্তিক আর্তধ্বনিও, রথের চূড়া যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্ধা করিতেছে সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হয়তো সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

তিনি এই বৃহৎ জাতীয়-ইতিহাসের এবং তীব্র মানব-ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।

মোগল সাম্রাজ্য যখন সম্পদে এবং ক্ষমতায় স্ফীত হইয়া একান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠিল, যখন সে সম্রাটের পক্ষে ন্যায়পরতা অনাবশ্যক বোধ করিয়া প্রজার সুখদুঃখে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িল, তখন তাহার জাগরণের দিন উপস্থিত হইল।

বিলাসিনী জেবউন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাট্‌দুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াধর্মের মস্তকে আপন জরিজহরৎজড়িত-পাদুকা-খচিত সুন্দর বামচরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল তখন কোন্ অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত প্রেম জাগ্রত হইয়া তাহার মর্মস্থলে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সুখমন্থরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল, আরামের পুষ্পশয্যা চিতাশয্যার মতো তাহাকে দগ্ধ করিল— তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীন ভাবে সমস্ত সুখ-সম্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিল, দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়াসনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর সুখ পাইল না, কিন্তু আপন

সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেবউন্নিসা সম্রাট্‌প্রাসাদের অবরুদ্ধ
অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধুলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার
জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্তজগৎ-বাসিনী
রমণী।

ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর
বিদীর্ণপ্রায় হৃদয় মাঝে মাঝে ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিয়া-কাঁদিয়া উঠিয়া
রাজসিংহের পরিণাম-অংশে বড়ো একটা রোমাঞ্চকর সুবিশাল করুণা ও
ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দুর্যোগের রাত্রে এক দিকে মোগলের
অভ্রভেদী পাষাণপ্রাসাদ ভাঙিয়া-ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর-এক দিকে
সর্বত্যাগিনী রমণীর অব্যক্ত ক্রন্দন ফাটিয়া-ফাটিয়া উঠিতেছে। সেই
বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিবে? কেবল যিনি
অন্ধকার রাত্রে অতন্দ্র থাকিয়া সমস্ত ইতিহাসপর্যায়কে নীরবে নিয়মিত
করিতেছেন তিনি এই ধূলিলুণ্ঠ্যমান ক্ষুদ্র মানবীকেও অনিমেষ লোচনে
নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে একসঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই
এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনা-
বহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব করিতে
হইয়াছে; কেহ কাহারও অগ্রবর্তী না হয়, এ বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ
লক্ষ ছিল দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখদুঃখ এবং
হৃদয়ের লীলা বিস্তার করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি
অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুটি-একটি
নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই একসঙ্গে
দেখাইতে চাহিয়াছেন। এইজন্য চিত্রে নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত
ক্ষুদ্র হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।
চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশি করিয়া দেখাইতে

চাহিতেন তবে নদীর অধিকাংশই তাঁহার চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত। হইতে পারে কোনো কোনো অতিকৌতূহলী পাঠক ঐ নৌকার অভ্যন্তর-ভাগ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র, এবং সেইজন্য মনক্ষোভে লেখককে তাঁহারা নিন্দা করিবেন। কিন্তু সেরূপ বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্তব্য, লেখক গ্রন্থবিশেষে কী করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন। পূর্ব হইতে একটি অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনাসংগত নহে। গ্রন্থপাঠারম্ভে আমি নিজে এই অপরাধ করিবার উপক্রম করিয়াছিলাম বলিয়াই এ কথাটা বলিতে হইল।

চৈত্র ১৩০০

ফুলজানি

শহরে বিচিত্র জটিল ঘটনা, লোকজনের গতিবিধি, গাড়িঘোড়া কল কারখানায় সমস্ত মানুষ ছোটো হইয়া যায় ; শহরে কে বাঁচিল কে মরিল, কে খাইল কে না খাইল, তাহার খবর কেহ রাখে না। সেখানে বড়োলাট-ছোটোলাটের কীর্তি, চীনে জাপানে লড়াই, অথবা একটা অসামান্য ঘটনা নহিলে সর্বসাধারণের কানেই উঠিতে পারে না।

কিন্তু পল্লীগ্রামে ছোটো বড়ো সকল মানুষ এবং মনুষ্যজীবনের প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এমন-কি, নদীনালা পুষ্করিণী মাঠঘাট পশুপক্ষী রৌদ্রবৃষ্টি সকাল-বিকাল সমস্তই বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানকার লোকালয়ে সুখদুঃখের সামান্যতম লহরীলীলা পর্যন্ত গণনার বিষয় হয়, এবং প্রকৃতির মুখশ্রীর সমস্ত ছায়ালোকসম্পাত একটি ক্ষুদ্র দিগন্তসীমার মধ্যে মহৎ প্রাধান্য লাভ করে।

উপন্যাসের মধ্যেও সেইরূপ শহর পল্লীগ্রামের প্রভেদ আছে। কোনো উপন্যাসে অসাধারণ মানবপ্রকৃতি জটিল ঘটনা এবং প্রচণ্ড হৃদয়বৃত্তির সংঘর্ষ বর্ণিত হইয়া থাকে ; সেখানে সাধারণ মনুষ্যের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ অণু-আকারে দৃষ্টির অতীত হইয়া যায়। আবার কোনো উপন্যাস উন্মত্ত ঘটনাবর্তের কোলাহল হইতে, উত্তুঙ্গ কীর্তিস্তম্ভ-মালার দিগন্তপ্রসারিত ছায়া হইতে, ঘনজনতাবন্যার সর্বগ্রাসী প্রলয়বেগ হইতে বহু দূরে ধূলিশূন্য নির্মল নীলাকাশতলে শস্যপূর্ণ শ্যামল প্রান্তর-প্রান্তে ছায়াময় বিহঙ্গকূজিত নিভৃত গ্রামের মধ্যে আপন রঙ্গভূমি স্থাপন করে, যেখানে মানবসাধারণের সকল কথাই কানে আসিয়া প্রবেশ করে এবং সকল সুখদুঃখই মমতা আকর্ষণ করিয়া আনে।

শ্রীশবাবুর ফুলজানি এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্যাস। ইহার স্বচ্ছতা, সরলতা, ইহার ঘটনার বিরলতাই ইহার প্রধান সৌন্দর্য। এবং পল্লীর

বাগানের উপর প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্যকিরণ যেমন করিয়া পড়ে— কোথাও বা চিকন পাতার উপরে ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া উঠে, কোথাও বা পাতার ছিদ্র বাহিয়া অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে চুম্‌কি বসাইয়া দেয়, কোথাও বা জীর্ণ গোয়াল-ঘরের প্রাঙ্গণের মধ্যে পড়িয়া মলিনতাকে ভূষিত করিতে চেষ্টা করে, কোথাও বা ঘনছায়াবেষ্টিত দীর্ঘিকাজলের একটিমাত্র প্রান্তে নিকষের উপর সোনার রেখা কষিয়া দেয়— তেমনি এই উপন্যাসের ইতস্তত যেখানে একটু অবকাশ পাইয়াছে সেইখানেই লেখকের একটি নির্মল স্নিগ্ধ হাস্য সকৌতুকে প্রবেশ করিয়া সমস্ত লোকালয়দৃশ্যটিকে উজ্জ্বলতায় অঙ্কিত করিয়াছে।

শ্রীশবাবু আমাদিগকে বাংলাদেশের যে-একটি পল্লীতে লইয়া গিয়াছেন সেখানে আমরা সকলের সকল খবর রাখিতে চাই, সকল লোকের সহিত আলাপ করিতে চাই, বিশ্রব্ধভাবে সকল স্থানে প্রবেশ করিতে চাই— তদপেক্ষা গুরুতর কিছুই প্রত্যাশা করি না। আমরা অভ্রভেদী এমন একটা-কিছু ব্যাপার চাহি না যাহাতে আর-সকলকেই তুচ্ছ করিয়া দেয়, যাহাতে একটি বিস্তীর্ণ শান্তিময় শ্যামল সমগ্রতাকে বিদীর্ণ ও খর্ব করিয়া ফেলে। এখানে সুগুনির মা এবং নিস্তারিণী, ফন্থ শেখ এবং নায়েবমহাশয়, সকলেই আমাদের প্রতিবেশী; পরস্পরের মধ্যে ছোটোবড়ো-ভেদ যতই থাক্, তথাপি সকলেরই ঘরের কথা আমাদের জিজ্ঞাস্য, প্রতিদিনের সংবাদ আমাদের আলোচ্য বিষয়। এরূপ উপন্যাস সুপরিচিত স্থানের ন্যায় আমাদের মনের পক্ষে অত্যন্ত বিরামদায়ক; এখানে অপ্রত্যাশিত কিছু নাই, মনকে কিছুতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় না, প্রত্যেক পদক্ষেপে এক-একটা দুরূহ সমস্যা জাগ্রত হইয়া উঠে না, সৌন্দর্যরস এত সহজে সম্ভোগ করা যায় যে, তাহার জন্য কোনোরূপ কৃত্রিম মাল-মশলার আবশ্যক করে না।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকার নিজের প্রতিভায় নিজে

সন্তুষ্ট নহেন, তিনি আপনাকে আপনি অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন। অরসিকদের চক্ষে যাহা সহজ তাহা তুচ্ছ ; গ্রন্থকার ক্ষমতাশালী লেখক হইয়াও সেই অরসিকমণ্ডলীর নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভনটুকু কাটাইতে পারেন নাই। তিনি হঠাৎ এক সময় আপন প্রতিভার স্বাভাবিক গতিকে বলপূর্বক প্রতিহত করিয়া তাহাকে অসাধারণ চরিত্র ও রোমহর্ষণ ঘটনাবলীর মধ্যে অসহায়ভাবে নিক্ষেপ করিয়াছেন। পরিচিত সহজ সৌন্দর্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয়সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য ক্ষমতার কাজ ; বাংলার লেখকসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশবাবুর সেই অসামান্য ক্ষমতাটি আছে, কিন্তু তিনি তদপেক্ষা আরও অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া পাঠককে চমৎকৃত করিতে চাহেন এবং সেই কাজ করিতে গিয়া নিজের প্রতিভার মধ্যে অনর্থক একটা আত্মবিরোধ বাধাইয়া বসেন। প্রতিভাবহির্গামী এই দুরাশায় তাঁহার প্রথমরচিত উপন্যাস 'শক্তিকানন'-এর মাঝখানে দাবানল জ্বালাইয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে, এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ফুলজানি'রও একটি প্রান্তভাগে তাহার একটি শিখা আপন প্রলয়রসনা বিস্তার করিয়াছে— সৌভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই।

সার্বভৌম-মহাশয়ের মেয়েটির নাম কালী, তাহার স্বভাব যেমন মিষ্ট তেমনি দুষ্ট, তেমনি স্বাভাবিক। গ্রন্থের নায়িকা ফুলকুমারীর প্রতি তাহার যে সুদৃঢ় ভালোবাসা সেও বড়ো স্বাভাবিক ; কারণ, ফুল নিতান্ত নিরুপায় ভীরুস্বভাব, এত অধিক নির্জীব যে পাঠকের হৃদয়াকর্ষণে সে সম্পূর্ণ সক্ষম নহে। কিন্তু এইরূপ নির্ভরপরায়ণ সামর্থ্যহীনের জন্যই বলিষ্ঠ তেজস্বী স্বভাব আপনাকে একান্ত বিসর্জন করিয়া থাকে। ফুলকুমারী যদিও গ্রন্থের নায়িকা, কিন্তু তাহাকে একটি শূন্যপটের মতো অবলম্বন করিয়া তাহার উপরে গ্রন্থকার কালীকেই অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই সামান্য পল্লীর কালো মেয়েটি অসাধারণ হয় নাই,

কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে কখন্ যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে তাহা জানিতেও পারা যায় না। বোসেদের ফুলবাগানের মধ্যে তালপুকুরের ধারে এই দুটি ক্ষুদ্র বালিকার সখিত্ব আমরা সস্নেহে সানন্দে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম; তাহার মধ্যে পাঠশালার ছেলেদের দৌরাত্ম্যকোলাহল, বালকবিদ্বেষী উত্ত্যক্ত বাগ্‌দিবুড়ির অভিশাপমন্ত্র, মধ্যাহ্নে পক্ষীনীড়লুণ্ঠক ছাত্রবৃন্দ-কর্তৃক আন্দোলিত ঘন আম্রবনের ছায়া এবং নিভৃত দীর্ঘিকার সন্তরণাকুল অগাধশীতল জলের তরঙ্গভঙ্গ মিশ্রিত হইয়া একটি মনোহর সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা পাঠকবর্গ ইহাতেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলাম, ইহার অধিক আর-কিছুই প্রার্থনা করি নাই। এমন সময় হরিশপুর পল্লীর সেই স্নিগ্ধ আম্রবনচ্ছায়ার মধ্যে একটুখানি অলৌকিকের ছায়া আসিয়া পড়িল। ফুল স্বপ্নে দেখিল যে, তাহার আসন্ন বিবাহ শুভ হইবে না এবং বাগ্‌দি-বুড়ির মুখেও যেন সেই অভিশাপ শুনিতে পাইল, এবং বটবৃক্ষের শাখা হইতেও সেই অভিশাপ ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখনই বুঝিলাম, ফুলকুমারীর বিবাহও সুখের হইবে না এবং পাঠকের কাব্যরসসম্ভোগের আনন্দেও অভিশাপ লাগিয়াছে। কিছুকাল পরে ফুলকুমারীও তাহার দুঃস্বপ্ন ভুলিয়া গেল, পাঠকও পুনশ্চ ক্ষুদ্র পল্লীর লোকসমাজে প্রবেশ করিয়া ভুলিয়া গেলেন যে তাঁহার একটা ফাঁড়া আছে।

সেখানে প্রবেশ করিয়া নায়েব মহেশ্বর ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শান্তিসৌন্দর্যময় পল্লীটির মধ্যে ইনিই রুদ্ররসের অবতারণা করিয়াছেন। রৌদ্রী-শক্তিতে গৃহিণী জগদ্ধাত্রী আবার স্বামীকেও অভিভূত করিয়াছেন। দেখিয়া মনে হয় যে, প্রজাবর্গ অসহায় হস্তীর ন্যায় পড়িয়া আছে; নায়েব সিংহের ন্যায় তাহাদের স্কন্ধের উপর চড়িয়া রুধির শোষণ করিতেছেন এবং গৃহিণী জগদ্ধাত্রী দেবীজগদ্ধাত্রীর ন্যায় এই প্রচণ্ড সিংহের স্কন্ধে পা রাখিয়া বসিয়া আছেন।

ছেলেটির নাম পুরন্দর। যদিচ তিনিই এই গ্রন্থের নায়ক, তথাপি

সাধারণ ছেলের মতো পাঠশালা হইতে পলায়ন করিয়া থাকেন, বটগাছে চড়িয়া কাকের ছানা পাড়িয়া আমোদ অনুভব করেন, গাছের ডাল হইতে ঝুপ্ করিয়া দীঘির জলের মধ্যে পড়িয়া ফুৎকারে আকাশে জলক্ষেপ করিতে করিতে চিৎসাঁতার কাটেন— দেখিয়া আমাদের বড়ো আশা হইয়াছিল পাঠকের কপালগুণে ছেলেটি আর যাহাই হউক অসাধারণ হইবে না। কিন্তু 'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায় তাই ভাবি মনে'। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

শান্ত মধুর অথচ সুদৃঢ়স্বভাব নিস্তারিণীর চরিত্র সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। এই নিস্তারিণীর কন্যা ফুলকুমারীর সহিত যথাকালে নায়েব-মহাশয়ের পুত্র পুরন্দরের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু নায়েব-মহাশয় এবং তাঁহার স্ত্রী জগদ্ধাত্রী তাঁহাদের বেহাইনের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। বিবাহের পর উভয় বৈবাহিক-পক্ষে ছোটোখাটো পল্লীযুদ্ধ চলিতে লাগিল। নায়েবমহাশয় পুত্র পুরন্দরকে তাঁহার বেহাইনের প্রভাব হইতে দূরে রাখিবার জন্য সঙ্গে করিয়া আপন কর্মস্থানে লইয়া গেলেন।

এইখানে আসিয়া মৌলভির নিকট হাফেজ পড়িয়া এবং পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পুরন্দর একটা নূতনতর মানুষ হইয়া উঠিল। মানুষের পরিবর্তন কিছুই অসম্ভব নহে এবং পুরন্দরের স্বভাবে পরি-বর্তনের প্রচুর কারণও ছিল। কিন্তু আমরা যে গ্রাম্যদৃশ্য, যে সরল লোকসমাজ, যে অনতিতরঙ্গিত ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে এতক্ষণ কালযাপন করিতেছিলাম নূতনীকৃত পুরন্দর তাহাকে যেন অত্যন্ত অতিক্রম করিবার উপক্রম করিল। পুরন্দর ভালো ছেলে হউক, সে ভালো; তাহার দানধ্যানে মতি হউক, হরিনামে প্রীতি হউক, শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি এবং হাফেজে অনুরাগ বাড়িতে থাক্, আমাদের দেশে সচরাচর যেরূপভাবে অনেক লোকের মনে সংসারবৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে পুরন্দরের

হৃদয়েও সেইরূপ বৈরাগ্যের সঞ্চার হউক— তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু তাহার বেশি কিছু হইতে গেলে তাহাকে আর সহ্য করা যায় না। কারণ, ফুলজানি-উপন্যাসকে সম্পূর্ণতা দেওয়াই পুরন্দর-চরিত্রের একমাত্র সার্থকতা। অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া যদি তিনি উপন্যাস নষ্ট করেন তবে আমরা তাঁহাকে মার্জনা করিতে পারিব না। প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইতে ফুলজানিতে যে-এক স্বচ্ছ সুন্দর সারল্য-স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল পুরন্দর হঠাৎ অসাধারণ উচ্চ হইয়া উঠিয়া তাহাকেই প্রতিহত করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থকর্তা পুরন্দর সম্বন্ধে লিখিতেছেন, 'বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে যে পরিবর্তন ঘটিতেছিল তাহার গতি এবং প্রকৃতি বিষাদের দিকে। মানুষ সংসারে, যে কারণেই হউক, দুঃখকষ্ট সহিতে আসিয়াছে— এইরকম তাহার মনের ভাব। আত্মজীবনের একটা লক্ষ্য তাহার তখনও স্থির হয় নাই কিন্তু আপনার বিষয়ে ভাবিতে বসিলেই তাহার মনে হইত, অতিঘোর আঁধারে তাহার ভবিষ্যৎ সমাচ্ছন্ন। মনের এই অবস্থায় আনন্দের ভিতরেও সে মনশ্চক্ষে দেখিত, যে কেহ তাহার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট সকলেরই জীবন অল্পবিস্তর দুঃখযন্ত্রণাময়।' পুরন্দরের এই অনাসৃষ্টি দুঃখভাবের গূঢ় কারণ অনতি-পরেই একটি ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে। একদা তিনি এবং তাঁহার বন্ধু ব্রজ বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন, গঙ্গাতীরে এক শালিকের কোটরের নিকট এক বিষধর সাপের সহিত শুকদম্পতির যুদ্ধ চলিতেছে। সেই পক্ষীদের নিরীহ শাবকগুলি এখনি সর্পের কবলস্থ হইবে মনে করিয়া পুরন্দরের চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল। তাহার সঙ্গী ব্রজ অসাধারণ বালক নহে, এইজন্য সে এক ফোঁটা জল না ফেলিয়া একখণ্ড লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল। তাহাতে অধিক কাজ হইল, আহত সর্পটা জলে পড়িয়া গেল। ব্রজ পুনশ্চ তাহার প্রতি লোষ্ট্রবর্ষণ করাতে পুরন্দর তাহা সহিতে পারিল না, বারণ করিল। 'সে ভাবিতেছিল, খাদ্য-খাদকের অহি-নকুলের যে

বিষম বিদ্বেষভাব ইহার জন্য কে দায়ী। ভগবানের সংসার প্রেমময় না হইয়া কেন এমন হিংসাদ্বেষসংকুল হইল?' ইত্যাদি ইত্যাদি। এই-সকল বক্তৃতা শুনিয়া 'ব্রজ সহসা কোনো উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার প্রিয় সুহৃদের হৃদয়ে ব্যথা কোন্‌খানে, বুঝিতে পারিল। বুঝিল, পুরনের দুঃখ ব্যক্তিগত নহে।'

টার্পিন তেল মালিশ করিলে যে-সকল ব্যথা সারে, অভাব মোচন হইলে যে-সকল দুঃখ দূর হয়, উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই-সকল ব্যথা এবং সেই-সকল দুঃখই ভালো। প্রচলিত প্রবাদে গরিবের ছেলের ঘোড়া-রোগকে যেরূপ অনর্থের হেতু বলিয়াছে, বাংলাদেশীয় পল্লীর ছেলের এ-সকল বড়ো বড়ো ব্যথা এবং উঁচু দরের দুঃখও সেইরূপ সর্বনাশের কারণ।

পুরন্দরের পিতা পুরন্দরকে লইয়া বাড়ি ফিরিবার সময় পথিমধ্যে অসন্তুষ্ট প্রজাগণকর্তৃক নিহত হইলেন, তাঁহার স্ত্রী জগদ্ধাত্রী সহমৃতা হইলেন। পুরন্দর এই আঘাতে পীড়িত হইয়া বাড়ি গেলেন, সেখানে তাঁহার স্ত্রীর শুশ্রূষায় জীবন লাভ করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া বিধবা নিস্তারিণী শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন।

এইখানে গ্রন্থ শেষ হইল, কিন্তু গ্রন্থকার ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি আবার শেষকে নিঃশেষ করিতে বসিলেন। অকস্মাৎ একদল যবন এবং যবনী মিলিয়া কালী ও ফুলকে চুরি করিয়া লইয়া গেল— কালী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মরিল; ফুল সিরাজউদ্দৌলার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, পুরন্দর তাহাকে উদ্ধার করিতে গেল এবং উভয়ে ঘাতকহস্তে বিনষ্ট হইল।

এ-সমস্ত কেন? আগাগোড়া গল্পের সহিত ইহার কী যোগ? প্রথম হইতে এমন কী-সকল অনিবার্য কারণ একত্র হইয়াছিল যাহাতে গ্রন্থের এই বিচিত্র পরিণাম অবশ্যম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল? গ্রন্থকার যদি বলিতেন 'গ্রামে হঠাৎ একটা মড়ক হইল এবং সকলেই মরিয়া গেল' তবে কাব্য

হিসাবে তাহার সহিত ইহার প্রভেদ কী? ১৬৬ পাতায় বইখানি সমাপ্ত। ১২২ পাতায় নিস্তারিণী তীর্থে গেলেন, তার পর ৪৪টি পত্রে গ্রন্থকার হঠাৎ একটা সম্পূর্ণ নূতন কাণ্ড ঘটাইয়া পাঠকগণকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। পূর্বে ইহার কোনো সূত্রপাত ছিল না, ফুলকুমারীর চরিত্রের সঙ্গেও ইহার কোনো যোগ ছিল না। এতক্ষণ গ্রন্থকার ১২২ পৃষ্ঠায় যে একটি সুন্দর সরল সমগ্র কাব্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসবশত শেষের ৪৪ পৃষ্ঠায় অতি সংক্ষেপে একটি আকস্মিক বজ্র নির্মাণ করিয়া তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন।

অগ্রহায়ণ ১৩০১

যুগান্তর

শিবনাথবাবুর যুগান্তর উপন্যাসখানি পাঠ করিতে করিতে কর্তব্যক্লান্ত
সমালোচকের চিত্ত বহুকাল পরে আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত
হইতেছিল। এমন পর্যবেক্ষণ, এমন চরিত্রসৃজন, এমন সুরস হাস্য, এমন
সরল সহৃদয়তা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। লেখক বিশ্বনাথ তর্কভূষণকে আমাদের
নিকট পরমাত্মীয়ের ন্যায় পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। এমন সত্য চরিত্র
বাংলা উপন্যাসে ইতিপূর্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। লেখক
তাঁহাকে সমস্ত তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষবৎ জাজ্বল্যমান দেখিয়াছেন—
তাঁহার চরিত্রটিকে প্রতিদিনের হাস্যে এবং অশ্রুজলে, দোষে এবং গুণে
অতি সহজেই সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। বিরলবসতি বঙ্গসাহিত্যরাজ্যে
তর্কভূষণমহাশয় যে একটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন এবং আমরা যে একটি
স্থায়ী বন্ধু লাভ করিলাম সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহমাত্র নাই।

কেবল তর্কভূষণকে কেন, লেখক বঙ্গসাহিত্যে নশিপুর-নামক আস্ত
একটি গ্রাম বসাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রামের ক্রিয়াকর্ম আমোদ-প্রমোদ
কৌতুক-উপদ্রব সুজন-দুর্জন সমস্তই পাঠকদের চিরসম্পত্তি হইয়া গিয়াছে।
তর্কভূষণের টোল, 'হাঁসের দল', চিমু ঘোষ, জহরলালের ইতিহাস, নূতন-
গঠিত সদ্য-পঠিত হইলেও তাহা আমাদের নিকট যেন অনেক কালের
পুরাতন পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। এ দিকে উলোর রামরতন মুখুজ্জের
ঘরে তর্কভূষণের কন্যা ভুবনেশ্বরীর ঘরকন্নাও আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ
সত্য এবং অত্যন্ত বেদনাজনক হইয়াছে। সংক্ষেপে তর্কভূষণ তাঁহার
গ্রাম, তাঁহার পরিবার, তাঁহার ছাত্রবর্গ, তাঁহার শত্রুমিত্র সকলকে লইয়া
একটি গ্রাম্যগ্রহমণ্ডলীর কেন্দ্রবর্তী সূর্যের ন্যায় আমাদের নিকট প্রবল
উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। এমন সময়ে আমাদের পরমদুর্ভাগ্য-
বশত উপন্যাসটি অকস্মাৎ যুগান্তরে লোকান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কোথায় গেল তর্কভূষণ, নশিপুর, হাঁসের দল— কোথা হইতে উপস্থিত নবীনচন্দ্র, হাতিবাগান, নবরত্নসভা। গ্রন্থকারও নূতন বেশ ধারণ করিলেন। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, হইলেন ঐতিহাসিক; ছিলেন ভাবুক, হইলেন নীতিপ্রচারক। আমরা রসসম্ভোগের সত্যযুগ হইতে তর্কবিতর্কের যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম। গ্রন্থকার পূর্বে যেখানে মানুষ গড়িতেছিলেন এখন সেখানে মত গড়িতে লাগিলেন, পূর্বে যেখানে আনন্দনিকেতন ছিল এখন সেখানে পাঠশালা বসিয়া গেল। এরূপ অঘটন সংঘটন হইল কেন তাহা বলিতে পারি না। তর্কভূষণের বিধবা ভগিনী বিজয়া এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্রের কলিকাতায় আগমন-কালটি তাঁহাদের নিজের পক্ষে সুক্ষণ, কিন্তু উপন্যাসের পক্ষে কুক্ষণ; কারণ সেই উপলক্ষটুকু অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের শেষার্ধটি প্রথমার্ধের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে কোনো অবশ্য যোগ নাই।

দুইটা মানুষকে এক দড়ি দিয়া বাঁধিলে ঐক্য হিসাবেও তাহাদের বল-বৃদ্ধি হয় না এবং দ্বৈত হিসাবেও তাহাদের সুবিধা হয় না। তেমনি দুই স্বতন্ত্র গল্পকে জবর্দস্তি করিয়া একত্র বাঁধিয়া দিলে একটা গল্পের হিসাবে তাহাদের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন পরিণতিতে বাধা দেওয়া হয়, দুইটা গল্পের হিসাবেও তাহাদিগকে আড়ষ্ট করিয়া বধ করা হয়। বর্তমান গ্রন্থেও তাহাই হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি দুটি গল্পকে বিচ্ছিন্ন আকারে রচনা করিতেন তাহা হইলে সম্ভবত দুটিকেই উৎকৃষ্ট গল্পে পরিণত করিতে পারিতেন।

দ্বিতীয় গল্পটির কথা বলিতে পারি না। কিন্তু প্রথম গল্পটি যে সাহিত্যের অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিত সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই।

আসল কথা, লেখক নিজেই নূতন যুগের মধ্যে বাস করিতেছেন। এমন-কি, নবযুগরথের চালকবর্গ-মধ্যে তিনিও একজন গণ্য ব্যক্তি। তিনি ইহার ঘর্ঘরশব্দ এবং জনতাকোলাহল হইতে কল্পনাযোগে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এত দূরে লইয়া যাইতে পারেন নাই যেখানে শান্তিতে বসিয়া

নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় ইহাকে চিত্রিত করিতে পারেন। বিচিত্র মতামত
এবং তর্কবিতর্কগুলা একেবারে গোটা আসিয়া পড়ে, তাহা রক্তমাংসের
মানবাকারে পরিণত হইয়া উঠে না। তাঁহার পঙ্কু ব্রজরাজ সুরেন্দ্রগুপ্ত
মথুরেশ এমন-কি নবীনও খুব ভালো ছেলে বটে, কিন্তু সজীব নহে। তাহারা
বীজগণিতের ক খ গ অক্ষরের ন্যায় কেবল কতকগুলি চিহ্নমাত্র।

সাহিত্যের চিত্রপটে স্থিতি অপেক্ষা গতি আঁকা শক্ত। যাহা
পুরাতন, যাহা স্থির, যাহা নানা দিকে নানা ভাবে সমাজের হৃদয় হইতে
রসাকর্ষণ করিয়া শ্যামল সতেজ এবং পরিপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে,
তাহাকে সত্য এবং সরল ভাবে পাঠকের মনে জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা
অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যাহা নূতন উঠিতেছে, যাহা চেষ্টা করিতেছে,
যুদ্ধ করিতেছে, পরিবর্তনের মুখে আবর্তিত হইতেছে, যাহা এখনও
সর্বাঙ্গীণ পরিণতি লাভ করে নাই, তাহাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত
করিতে হইলে বিস্তর সূক্ষ্মবিশ্লেষণ অথবা ঘাতপ্রতিঘাত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার
মধ্য দিয়া বিচিত্র নাট্যকলা প্রয়োগ আবশ্যক হয়। কিন্তু সেরূপ
করিতে হইলে রচনার বিষয় হইতে রচয়িতার নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিয়া
লইতে হয়। অত্যন্ত কাছে থাকিলে, মণ্ডলীর কেন্দ্রের মধ্যে বাস করিলে,
সমগ্রের তুলনায় তাহার অংশগুলি, ব্যক্তির তুলনায় তাহার মতগুলি,
কার্যপ্রবাহের তুলনায় তাহার উদ্দেশ্যগুলি যেরূপ বেশি করিয়া চোখে
পড়ে— তাহাতে রচনা সত্যবৎ হয় না, তাহার পরিমাণ-সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া
যায় এবং বাহিরের নির্লিপ্ত পাঠকদের নিকটে কিরূপে বিষয়টিকে সমগ্র
এবং সপ্রমাণ করিতে হইবে তাহার ঠাহর থাকে না।

কিন্তু এই দ্বিতীয় নম্বর গল্পটিতেও লেখক যেখানেই নবযুগের আবর্ত
ছাড়িয়া খাঁটি মানুষগুলির কথা বলিয়াছেন সেইখানেই দুই-চারিটি সবল
বর্ণনায়, স্বল্প রেখাপাতে, অতি সহজেই চিত্র আঁকিয়াছেন এবং পাঠকের
হৃদয়কে রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এক স্থলে গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে শ্রীধর

ঘোষের সহিত কেবল চকিতের মতো আমাদের পরিচয় করাইয়া তাহাকে অপসৃত করিয়া দিয়াছেন— কিন্তু সেই স্বল্প কালের পরিচয়েই আমাদের মনে একটা আক্ষেপ রাখিয়া দিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, লেখক মনোযোগ করিলে এই শ্রীধর ঘোষটিকে একটি গ্রন্থের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া আর-একটি উপন্যাসকে প্রাণদান করিতে পারিতেন। আমরা শ্রীধরের সংক্ষেপ পরিচয়টি এ স্থলে উদ্‌ধৃত করি—

'এই ঘোষপরিবার বৈষ্ণব পরিবার, গোঁসায়ের শিষ্য। শ্রীধর ঘোষ মহাশয় অতি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। উদরান্নের জন্য ম্লেচ্ছের অধীনে কাজ করিতেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। আপিসে যখন কর্ম করিতেন তখন তাঁহার নাসাতে তিলক ও সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দৃষ্ট হইত।··· মানুষটি শ্যামবর্ণ সুস্থ ও সবলদেহ ছিলেন, মুখটি সদ্ভাবে ও ভক্তিতে যেন গদগদ, সে মুখ দেখিলেই কেমন হৃদয় স্বভাবত তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত। ঘোষজা মহাশয় আপিসের প্রবেশের দ্বারের পার্শ্বের ঘরেই বসিতেন, এবং যত-গাড়ি মাল আমদানি ও রপ্তানি হইত তাহার হিসাব রাখিতেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আপিসে প্রবেশের সময়ে অনেকবার এই প্রশ্ন শুনিতে হইত, কী ঘোষজা, খবর কী? সব কুশল তো? অমনি ঘোষজার উত্তর, আজ্ঞে, গোবিন্দের প্রসাদে সবই-কুশল। ঘোষজা দোলের সময় কিছু ব্যয় করিতেন, লোক-জনকে শ্রদ্ধাসহকারে আহ্বান করিয়া উত্তমরূপে খাওয়াইতেন; এইজন্য আপিসের লোকে মাঘ মাস পড়িলেই জিজ্ঞাসা করিত, কী ঘোষজামশাই, এবার দোল করবেন তো? অমনি উত্তর, আজ্ঞে, কী জানি, যা গোবিন্দের ইচ্ছা। গোবিন্দের প্রতি নির্ভরের ভাব তাঁহার এমন স্বাভাবিক ছিল যে, আট বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রটির কাল হইলে তাহারই তিন-চারি দিন পরে আপিসের একজন লোক জিজ্ঞাসা করিলেন, কী ঘোষজামশাই, ছেলে দুটো মানুষ হচ্ছে তো? ঘোষজা উত্তর করিলেন,

আজ্ঞে, ছুটো আর কৈ ?— এখন তো একটি, কেবল বড়োটিই আছে। প্রশ্নকর্তা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, সে ছেলেটির কী হইল ? ঘোষজা উত্তর করিলেন, আজ্ঞে, গোবিন্দ সেটিকে নিয়েছেন।... তিনি সাধ করিয়া নাতি-নাতনীদের নাম রাখিয়াছিলেন। পুত্রের সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা হইলে তাহার নাম রাধারানী রাখিলেন।... সর্বজ্যেষ্ঠা রাধারানী তাঁহার প্রথম আদরের ধন ছিল। রাধে! রাজনন্দিনী! গরবিনী! শ্যামসোহাগিনী! বলিয়া যখন ডাকিতেন, তখন এক বৎসরের বালিকা রাধারানী অচিরোদ্গত-দন্তাবলী-শোভিত মুখচন্দ্রে একটু হাসিয়া ঝাঁপাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া পড়িত। তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন, রাখালের সনে প্রেম করিস নে রাই! অমনি চক্ষে জলধারা বহিত।'

এ দিকে শিশুকন্যা টিমিমণি, নবীনের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃবধূর সম্বন্ধ, নবীনের রাঙা মা— এগুলিও লেখক বড়ো সরল এবং সরস সুমিষ্ট ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

লেখক ধারাবাহিক গল্পের প্রতি বড়ো-একটা দৃষ্টিপাত করেন নাই; আমরাও গল্পের জন্য বিশেষ লালায়িত নহি। আমরা একজন রীতিমত মনুষ্যের আনন্দজনক বিশ্বাসজনক জীবনবৃত্তান্ত চাহি— নশিপুর গ্রামে তর্কভূষণ-পরিবারের আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিয়া যাইতে আমাদের কিছুমাত্র শ্রান্তিবোধ হইত না; কারণ, তর্কভূষণ আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন এবং লেখকও তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিনী হাস্যবর্ষিণী কল্পনাশক্তি-দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু লেখক দুইখানি বহির পাতা পরস্পর উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া এক সঙ্গে বাঁধাইয়া দপ্তরীর অন্ন মারিয়াছেন এবং পাঠকদিগের রসভঙ্গ করিয়াছেন। এ আক্ষেপ আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না।

চৈত্র ১৩০১

আর্যগাথা

গ্রন্থখানি সংগীতপুস্তক, এইজন্য ইহার সম্পূর্ণ সমালোচনা সম্ভবে না। কারণ, গানে কথার অপেক্ষা সুরেরই প্রাধান্য। সুর খুলিয়া লইলে অনেক সময়ে গানের কথা অত্যন্ত শ্রীহীন এবং অর্থশূন্য হইয়া পড়ে, এবং সেইরূপই হওয়া উচিত। কারণ, সংগীতের দ্বারা যখন আমরা ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি তখন কথাকে উপলক্ষ্যমাত্র করাই আবশ্যক; কথার দ্বারাই যদি সকল কথা বলা হইয়া যায় তবে সংগীত সেখানে খর্ব হইয়া পড়ে। কথার দ্বারা আমরা যাহা ব্যক্ত করিয়া থাকি তাহা বহুল পরিমাণে সুস্পষ্ট সুপরিস্ফুট, কিন্তু আমাদের মনে অনেক সময় এমন-সকল ভাবের উদয় হয় যাহা নামরূপে নির্দেশ বা বর্ণনায় প্রকাশ করিতে পারি না, যাহা কথার অতীত, যাহা অহৈতুক; সেই-সকল ভাব, অন্তরাত্মার সেই-সমস্ত আবেগ-উদ্‌বেগগুলি সংগীতেই বিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত হইতে পারে। হিন্দুস্থানি গানে কথা এতই যৎসামান্য যে তাহাতে আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না— ননদিয়া গগরিয়া চুনরিয়া আমরা কানে শুনিয়া যাই মাত্র; কিন্তু সংগীতের সহস্রবাহিনী নির্ঝরিণী সেই-সমস্ত কথাকে তুচ্ছ উপলখণ্ডের মতো প্লাবিত করিয়া দিয়া আমাদের হৃদয়ে এক অপূর্ব সৌন্দর্যবেগ, এক অনির্বচনীয় আকুলতার আন্দোলন সঞ্চার করিয়া দেয়। সামান্যত পাথরের নুড়ি বালকের খেলেনা মাত্র। হিন্দিগানের কথাও সেইরূপ ছেলেখেলা। কিন্তু নির্ঝরের তলে সেই নুড়িগুলি ঘাতে প্রতিঘাতে জলস্রোতকে মুখরিত করিয়া তোলে, বেগবান প্রবাহকে বিবিধ বাধা-দ্বারা উচ্ছ্বসিত করিয়া অপরূপ বৈচিত্র্য দান করে। হিন্দি গানের কথাও সেইরূপ সুরপ্রবাহকে বিচিত্র শব্দসংঘর্ষ এবং বাধার দ্বারা উচ্ছ্বসিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে, অর্থগৌরব বা কাব্য-সৌন্দর্যের দ্বারা তাহাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে না। ছন্দ সম্বন্ধেও

এ কথা খাটে। নদী যেমন আপনার পথ আপনি কাটিয়া যায় গানও তেমনি আপনার ছন্দ আপনি গড়িয়া গেলেই ভালো হয়। অধিকাংশ স্থলেই হিন্দি গানের কথায় কোনো ছন্দ থাকে না, সেইজন্যই ভালো হিন্দি গানের তালের গতিবৈচিত্র্য এমন অভাবিতপূর্ব ও সুন্দর। সে ইচ্ছামত হ্রস্বদীর্ঘের সামঞ্জস্যবিধান করিতে করিতে চলে, স্বাধীনতার সহিত সংযমের সমন্বয়সাধন করিতে করিতে বিজয়ী সম্রাটের গুরুগম্ভীর ভেরিধ্বনি-সহকারে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহাকে পূর্বকৃত বাঁধা ছন্দের মধ্য দিয়া চালনা করিয়া লইয়া গেলে তাহার বৈচিত্র্য এবং গৌরবের হানি হইয়া থাকে। কাব্য স্বরাজ্যে একাধিপত্য করিতে পারে, কিন্তু সংগীতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহার পক্ষে অনধিকারচর্চা হয়।

বিশুদ্ধ কাব্য এবং বিশুদ্ধ সংগীত স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যাদেবীগণের মহল পৃথক হইলেও তাঁহারা কখনো কখনো একত্র মিলিয়া থাকেন। সংগীতে ও কাব্যে মধ্যে মধ্যে সেরূপ মিল দেখা যায়। তখন উভয়েই পরস্পরের জন্য আপনাকে কথঞ্চিৎ সংকুচিত করিয়া লন ; কাব্য আপন বিচিত্র অলংকার পরিত্যাগ করিয়া নিরতিশয় স্বচ্ছতা ও সরলতা অবলম্বন করেন, সংগীতও আপন তাল-সুরে উদ্দাম লীলাভঙ্গকে সম্বরণ করিয়া সখ্যভাবে কাব্যের সাহচর্য করিতে থাকেন।

হিন্দুস্থানে বিশুদ্ধ সংগীত প্রাবল্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশে কাব্য ও সংগীতের সম্মিলন ঘটিয়াছে। গানের যে-একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য, একটি স্বাধীন পরিণতি, তাহা এ দেশে স্থান পায় নাই। কাব্যকে অন্তরের মধ্যে ভালো করিয়া ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্যই এ দেশে সংগীতের অবতারণা হইয়াছিল। কবিকঙ্কণচণ্ডী অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি বড়ো বড়ো কাব্যও সুর-সহকারে সর্বসাধারণের নিকট পঠিত হইত। বৈষ্ণব

কবিদিগের গানগুলিও কাব্য— কেবল চারি দিকে উড়িয়া ছড়াইয়া পড়িবার জন্য সুরগুলি তাহাদের ডানাস্বরূপ হইয়াছিল। কবিরা যে কাব্যরচনা করিয়াছেন সুর তাহাই ঘোষণা করিতেছে মাত্র।

বঙ্গদেশে কীর্তনে কাব্য ও সংগীতের সম্মিলন এক আশ্চর্য আকার ধারণ করিয়াছে। তাহাতে কাব্যও পরিপূর্ণ এবং সংগীতও প্রবল। মনে হয় যেন ভাবের-বোঝাই-পূর্ণ সোনার কবিতা, ভরা সুরের সংগীত-নদীর মাঝখান দিয়া বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। সংগীত কেবল যে কবিতাটিকে বহন করিতেছে তাহা নহে, তাহার নিজেরও একটা ঐশ্বর্য এবং ঔদার্য এবং মর্যাদা প্রবলভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে উভয় শ্রেণীরই গান দেখা যায়। ইহার মধ্যে কতকগুলি গান আছে যাহা সুখপাঠ্য নহে, যাহার ছন্দ ও ভাববিন্যাস সুরতালের অপেক্ষা রাখে— সেগুলি সাহিত্যসমালোচকের অধিকার-বহির্ভূত। আর কতকগুলি গান আছে যাহা কাব্য হিসাবে অনেকটা সম্পূর্ণ, যাহা পাঠ মাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্যের সঞ্চার করে। যদিচ সে গানগুলির মাধুর্যও সম্ভবত সুরসংযোগে অধিকতর পরিস্ফুটতা গভীরতা এবং নূতনত্ব লাভ করিতে পারে, তথাপি ভালো এন্‌গ্রেভিং হইতে তাহার আদর্শ অয়েল্‌পেন্টিঙের সৌন্দর্য যেমন অনেকটা অনুমান করিয়া লওয়া যায় তেমনি কেবলমাত্র সেই-সকল কবিতা হইতে গানের সমগ্র মাধুর্য আমরা মনে মনে পূরণ করিয়া লইতে পারি। উদাহরণস্বরূপে 'একবার দেখে যাও, দেখে যাও কত দুখে যাপি দিবা নিশি' কীর্তনটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। ইহা বেদনায় পরিপূর্ণ, অনুরাগে অনুনয়ে পরিপ্লুত। পাঠ করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে ইহার আকৃতিপূর্ণ সংগীতটি আমাদের কল্পনায় ধ্বনিত হইতে থাকে। সম্ভবত যে সুরে এই গান বাঁধা হইয়াছে তাহা আমাদের কল্পনার আদর্শের সহিত তুলনীয় হইতে

পারে না। না হইবারই কথা, কারণ এই কবিতাটি কিঞ্চিৎ বৃহৎ এবং বিচিত্র, এবং আমাদের সংগীত সাধারণত একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত স্থায়ী ভাব অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, ভাব হইতে ভাবান্তরে বিচিত্র আকারে ও নব নব ভঙ্গীতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে না। এইজন্য আমাদের বক্ষ্যমাণ কবিতাটির উপযুক্ত রাগিণী আমরা সহজে প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু কোনো সুর না থাকিলেও ইহাকে আমরা গান বলিব ; কারণ, ইহাতে আমাদের মনের মধ্যে গানের একটা আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া দেয়, যেমন ছবিতে একটা নির্ঝরিণী আঁকা দেখিলে তাহার গতিটি আমরা মনের ভিতর হইতে পূরণ করিয়া লই। গান এবং কবিতার প্রভেদ আমরা এই গ্রন্থ হইতেই তুলনার দ্বারা দেখাইয়া দিতে পারি।—

সে কে ?— এ জগতে কেহ আছে, অতি উচ্চ মোর কাছে
যার প্রতি তুচ্ছ অভিলাষ ;
সে কে ?— অধীন হইয়ে তবু রহে যে আমার প্রভু,
প্রভু হয়ে আমি যার দাস ;
সে কে ?— দূর হতে দূরাত্মীয়, প্রিয়তম হতে প্রিয়,
আপন হইতে যে আপন ;
সে কে ?— লতা হতে ক্ষীণ তারে বাঁধে দৃঢ় যে আমারে,
ছাড়াতে পারি না আজীবন ;
সে কে ?— দুর্বলতা যার বল, মর্মভেদী অশ্রুজল,
প্রেম-উচ্চারিত রোষ যার ;
সে কে ?— যার পরিতোষ মম সফল জনম-সম,
সুখ সিদ্ধি সব সাধনার ;
সে কে ?— হলেও কঠিন-চিত শিশুসম স্নেহভীত
যার কাছে পড়ি গিয়া নুয়ে ;

সে কে ?— বিনা দোষে ক্ষমা চাই যার, অপমান নাই
শতবার পা দুখানি ছুঁয়ে ;
সে কে ?— মধুর দাসত্ব যার, লীলাময় কারাগার,
শৃঙ্খল নূপুর হয়ে বাজে ;
সে কে ?— হৃদয় খুঁজিতে গিয়া নিজে যাই হারাইয়া
যার হৃদি-প্রহেলিকা-মাঝে ।

ইহা কবিতা, কিন্তু গান নহে। সুরসংযোগে গাহিলেও ইহাকে গান বলিতে পারি না। ইহাতে ভাব আছে এবং ভাবপ্রকাশের নৈপুণ্যও আছে, কিন্তু ভাবের সেই স্বত-উচ্ছ্বসিত সদ্য-উৎসারিত আবেগ নাই যাহা পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে প্রহত তন্ত্রীর ন্যায় একটা সংগীতময় কম্পন উৎপাদন করিয়া তুলে ।—

ছিল বসি সে কুসুমকাননে ।
আর অমল অরুণ উজল আভা
ভাসিতেছিল সে আননে ।
ছিল এলায়ে সে কেশরাশি— ছায়াসম হে ;
ছিল ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি,
অতুল গরিমারাশি ।
সেথা ছিল না বিষাদভাষা— অশ্রুভরা গো ;
সেথা বাঁধা ছিল শুধু সুখের স্মৃতি,
হাসি, হরষ, আশা ;
সেথা ঘুমায়ে ছিল রে পুণ্য প্রীতি,
প্রাণভরা ভালোবাসা ।
তার সরল সুঠাম দেহ— প্রভাময় গো, প্রাণভরা গো ;
যেন যা কিছু কোমল ললিত, তা দিয়ে
রচিয়াছে তাহে কেহ ;

পরে স্বজিল সেথায় স্বপন, সংগীত,
সোহাগ, শরম, স্নেহ।
যেন পাইল রে উষা প্রাণ— আলোময়ী রে ;
যেন জীবন্ত কুসুম, কনকভাতি,
সুমিলিত, সমতান।
যেন সজীব সুরভি মধুর মলয়,
কোকিলকূজিত গান।

শুধু চাহিল সে মোর পানে— একবার গো ;
যেন বাজিল বীণা মুরজ মুরলী
অমনি অধীর প্রাণে,
সে গেল কী দিয়া, কী নিয়া, বাঁধি মোর হিয়া
কী মন্ত্রগুণে কে জানে।

এই কবিতাটির মধ্যে যে রস আছে তাহাকে আমরা গীতরস নাম দিতে পারি ; অর্থাৎ লেখক একটি সুখস্মৃতি এবং সৌন্দর্যস্বপ্নে আমাদের মনকে যেরূপ ভাবে আবিষ্ট করিয়া তুলিতে চাহেন তাহা সংগীত দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে এবং যখন কোনো কবিতা বিশেষ মন্ত্রগুণে অনুরূপ ফল প্রদান করে তখন মনের মধ্যে যেন একটি অব্যক্ত গীতধ্বনি গুঞ্জরিত হইতে থাকে। যাঁহারা বৈষ্ণবপদাবলী পাঠ করিয়াছেন অন্যান্য কবিতা হইতে গানের কবিতার স্বাতন্ত্র্য তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

আমরা সামান্য কথাবার্তার মধ্যেও যখন সৌন্দর্যের অথবা অনুভবের আবেগ প্রকাশ করিতে চাহি তখন স্বতই আমাদের কথার সঙ্গে সুরের ভঙ্গী মিলিয়া যায়। সেইজন্য কবিতায় যখন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যমোহ অথবা ভাবের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয় তখন কথা তাহার চিরসঙ্গী সংগীতের জন্য একটা

আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে থাকে।—

এসো এসো বঁধূ এসো, আধো আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি!

এই পদটিতে যে গভীর প্রীতি এবং একান্ত আত্মসমর্পণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কি কথার দ্বারা হইয়াছে? না, আমরা মনের ভিতর হইতে একটা কল্পিত করুণ সুর সংযোগ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছি? ওই দুটি ছত্রের মধ্যে যে ক'টি কথা আছে তাহার মতো এমন সামান্য, এমন সরল, এমন পুরাতন কথা আর কী হইতে পারে? কিন্তু উহার ওই অত্যন্ত সরলতাই শ্রোতাদের কল্পনার নিকট হইতে সুর ভিক্ষা করিয়া লইতেছে। এইজন্য ওই কবিতার সুর না থাকিলেও উহা গান। এইজন্যই—

হরষে বরষ-পরে যখন ফিরি রে ঘরে
সে কে রে আমারি তরে আশা ক'রে রহে বলো;
স্বজন সুহৃদ সবে উজল-নয়ন যবে
কার প্রিয় আঁখিদুটি সব-চেয়ে সমুজল!

ইহা কানাড়ায় গীত হইলেও গান নহে, এবং—

চাহি অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখপানে,
ফিরিতে চাহে না আঁখি;
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,
অবাক হইয়ে থাকি!

ইহাতে কোনো রাগিণীর নির্দেশ না থাকিলেও ইহা গান।

সর্বশেষে আমরা আর্যগাথা হইতে একটি বাৎসল্যরসের গান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহাতে পাঠকগণ স্নেহের সহিত কৌতুকের সম্মিশ্রণ দেখিতে পাইবেন।—

এ কি রে তার ছেলে-খেলা, বকি তায় কি সাধে—
যা দেখবে বলবে, 'ওমা, এনে দে, ও মা, দে।'
'নেব নেব' সদাই কি এ?
পেলে পরে ফেলে দিয়ে
কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলে, হাসতে গিয়ে কাঁদে।
এত খেলার জিনিস ছেড়ে
বলে কিনা দিতে পেড়ে
অসম্ভব যা, তারায় মেঘে বিজলিরে চাঁদে!
শুনল কারো হবে বিয়ে
ধরল ধুয়ো অমনি গিয়ে
'ও মা, আমি বিয়ে করব'— কান্নার ওস্তাদ এ!
শোনে কারো হবে ফাঁসি
অমনি আঁচল ধরল আসি—
'ও মা, আমি ফাঁসি যাব'— বিনি অপরাধে!

অগ্রহায়ণ ১৩০১

আষাঢ়ে

লেখক তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং আমরাও তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, বাংলা পাঠক-সমাজে তাঁহার নাম গোপন থাকিবে না।

'আষাঢ়ে' কতকগুলি হাস্যরসপ্রধান কবিতা। তাহার অনেকগুলিই গল্প-আকারে রচিত। গল্পগুলিকে 'আষাঢ়ে' আখ্যা দিয়া গ্রন্থকার পাঠকদিগকে পূর্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ, আমরা বাঙালি পাঠকেরা অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বেরসিক বর যেমন বাসর-ঘরের অপ্রত্যাশিত রসিকতায় খাপা হইয়া উঠে আমরাও তেমনি ছাপার বই খুলিয়া হঠাৎ আদ্যোপান্ত কৌতুক দেখিতে পাইলে ছিব্‌লামি সহ্য করিতে পারি না।

বইখানির মধ্যে গায়ে বাজে এমনতরো কৌতুকও আছে। ইহার শেষ কবিতার নাম 'কর্ণবিমর্দন'। কিন্তু এই মর্দন ব্যাপারটি সকল কবিতাতেই কিছু-না-কিছু আছে। গল্পপ্রসঙ্গে সামাজিক কপটতার যে অংশটাই কবির হাতের কাছে আসিয়াছে সেইখানেই তিনি একটুখানি সহাস্য টিপ্পনি প্রয়োগ করিয়াছেন।

এরূপ প্রকৃতির রহস্যকবিতা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং 'আষাঢ়ে'র কবি অপূর্ব প্রতিভাবলে ইহার ভাষা ভঙ্গী বিষয় সমস্তই নিজে উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছেন।

ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সংগত। কিন্তু যেরূপ বিষয় সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি-যাত্রা বর্ণনা করিতে মেঘনাদ-বধের দুন্দুভিনিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন ?'

ভাষা সম্বন্ধে কবি যাহা লিখিয়াছেন সে ঠিক কথা। কিন্তু ছন্দ সম্বন্ধে তিনি কোনো কৈফিয়ত দেন নাই এবং দিলেও আমরা গ্রহণ করিতে পারিতাম না। পদ্যকে সমিল গদ্য-রূপে চালাইবার কোনো হেতু নাই। ইহাতে পদ্যের স্বাধীনতা বাড়ে না, বরঞ্চ কমিয়া যায়। কারণ, কবিতা পড়িবার সময় পদ্যের নিয়ম রক্ষা করিয়া পড়িতে স্বতই চেষ্টা জন্মে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যদি স্খলন হইতে থাকে তবে তাহা বাধাজনক ও পীড়াদায়ক হইয়া উঠে।

বায়্‌রনের ডন্‌জুয়ানে কবি অবলীলাক্রমে যথেচ্ছ কৌতুকের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু নির্দোষ ছন্দের সুকঠিন নিয়মের মধ্যেই সেই অনায়াস অবলীলাভঙ্গী পাঠককে এরূপ পদে পদে বিস্মিত করিয়া তোলে।

ইঙ্গোল্‌ড্‌স্‌বি-কাহিনী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কৌতুক-কাব্যেও ছন্দের অস্খলিত পারিপাট্য বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

বস্তুত, ছন্দের শৈথিল্যে হাস্যরসের নিবিড়তা নষ্ট করে। কারণ হাস্যরসের প্রধান দুইটি উপাদান অবাধ দ্রুতবেগ এবং অভাবনীয়তা। যদি পড়িতে গিয়া ছন্দে বাধা পাইয়া যতি স্থাপন সম্বন্ধে দুই-তিন বার দুই তিন রকম পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় তবে সেই চেষ্টার মধ্যে হাস্যের তীক্ষ্ণতা আপন ধার নষ্ট করিয়া ফেলে।

অবশ্য, কোনো নূতন ছন্দ প্রথম পড়িতে কষ্ট হয় এবং যাঁহাদের ছন্দে স্বাভাবিক কান নাই তাঁহারা পরের উপদেশ ব্যতীত তাহা কোনো কালেই পড়িতে পারেন না। কিন্তু আলোচ্য ছন্দের প্রধান বাধা তাহার নূতনত্ব নহে। তাহার সর্বত্র এক নিয়ম বজায় থাকে নাই, এইজন্য পড়িতে পড়িতে আবশ্যক-মত কোথাও টানিয়া কোথাও ঠাসিয়া কমিবেশি করিয়া চলিতে হয়। এমন করিয়া বরঞ্চ মনে মনে পড়া চলে, কিন্তু কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতে হইলে পদে পদে অপ্রতিভ হইতে হয়।

অথচ শোনাইবার যোগ্য এমন কৌতুকাবহ পদার্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। আজকাল বাংলা কবিতা-আবৃত্তির দিকে একটা ঝোঁক পড়িয়াছে। আবৃত্তির পক্ষে কৌতুককবিতা অত্যন্ত উপাদেয়। অথচ 'আষাঢ়ে'র অনেকগুলি কবিতা ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা-বশত আবৃত্তির পক্ষে সুগম হয় নাই বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে।

অথচ ছন্দের এবং মিলের উপর গ্রন্থকারের যে আশ্চর্য দখল তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তপ্ত লৌহচক্রে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি হইতে থাকে, তাঁহার ছন্দের প্রত্যেক ঝোঁকের মুখে তেমনি করিয়া মিল-বর্ষণ হইয়াছে। সেই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের মতো আকস্মিক হাস্যোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। ছন্দের কঠিনতাও যে কবিকে দমাইতে পারে না, তাহারও অনেক উদাহরণ আছে। কবি নিজেই তাঁহার অপেক্ষাকৃত পরবর্তী রচনাগুলিকে নিয়মিত ছন্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে স্থায়িত্ব এবং উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাঁহার 'বাঙালি-মহিমা' 'ইংরাজ-স্তোত্র' 'ডিপুটি-কাহিনী' ও 'কর্ণবিমর্দন' সর্বত্র উদ্‌ধৃত পঠিত ও ব্যবহৃত হইবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছে। এই লেখাগুলির মধ্যে যে সুনিপুণ হাস্য ও সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আছে তাহা শাণিত সংযত ছন্দের মধ্যে সর্বত্র ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

প্রতিভার প্রথম উদ্দাম চেষ্টা আরম্ভেই একটা নূতন পথের দিকে ধাবিত হয়, তাহার পর পরিণতি-সহকারে পুরাতন বন্ধনের মধ্যে ধরা দিয়া আপন মর্মগত নূতনত্বকে বহিঃস্থিত পুরাতনের উপর দ্বিগুণতর উজ্জ্বল আকারে পরিস্ফুট করিয়া তুলে। 'আষাঢ়ে'র গ্রন্থকর্তাও যে-কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছেন সকলেরই মধ্যে তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু যে কবিতাগুলি তিনি ছন্দের পুরাতন ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়াছেন তাহাদের মধ্যে নূতনত্বের উজ্জ্বলতা ও পুরাতনের স্থায়িত্ব উভয়ই একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস,

কবিও তাহা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহার হাস্যসৃষ্টির নীহারিকা ক্রমে ছন্দোবন্ধে ঘনীভূত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে হাস্যালোকের ধ্রুব নক্ষত্রপুঞ্জ রচনা করিবে।

শুদ্ধমাত্র অমিশ্র হাস্য ফেনরাশির মতো লঘু এবং অগভীর। তাহা বিষয়পুঞ্জের উপরিতলের অস্থায়ী উজ্জ্বল বর্ণপাত মাত্র। কেবল হাস্যরসের দ্বারা কেহ যথার্থ অমরতা লাভ করে না। রুপালির পাতের মধ্যে শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতা আছে বটে, কিন্তু তাহার লঘুত্ব ও অগভীরতা -বশত তাহার মূল্যও অল্প এবং তাহার স্থায়িত্বও সামান্য। সেই উজ্জ্বলতার সঙ্গে রৌপ্যপিণ্ডের কাঠিন্য ও ভার থাকিলে তাহার মূল্য বৃদ্ধি করে; হাস্যরসের সঙ্গে চিন্তা এবং ভাবের ভার থাকিলে তবে তাহার স্থায়ী আদর হয়। সমালোচ্য গ্রন্থে 'বাঙালি-মহিমা' 'কর্ণ-বিমর্দন-কাহিনী' প্রভৃতি কবিতায় যে হাস্য প্রকাশ পাইতেছে তাহা লঘু হাস্যমাত্র নহে, তাহার মধ্যে কবির হৃদয় রহিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে জ্বালা ও দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং ধিক্কারের দ্বারা তাহা গৌরববিশিষ্ট।

তাহা ছাড়া সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে 'আষাঢ়ে'-রচয়িতার এমন-সকল কবিতা বাহির হইয়াছে যাহাতে হাস্য এবং অশ্রুরেখা, কৌতুক এবং কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয়। তিনি যে কেবল বাঙালিকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই, সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন, এমন আশ্বাস দিয়াছেন।

অগ্রহায়ণ ১৩০৫

মন্দ্র

মন্দ্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নূতন-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থ-খানিকে আমরা সাহিত্যের আসরে সাদর অভিবাদনের সঙ্গে আহ্বান করিয়া আনিব— ইহাকে আমরা মুহূর্তমাত্র দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারিব না।

গ্রন্থসমালোচনা সম্পাদকের কর্তব্য বলিয়াই গণ্য। অনেকেই অতিমাত্র আগ্রহের সঙ্গেই এ কর্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু আমাদের এ সম্বন্ধে ব্যগ্রতার যথেষ্ট অভাব আছে, সে কথা স্বীকার করি।

মন্দ্র কাব্যখানিকে অবলম্বন করিয়া আমরা অকস্মাৎ কর্তব্য পালন করিতে আসি নাই। গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের এই উদ্যম।

মন্দ্র কাব্যখানি বাংলার কাব্যসাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ইহা নূতনতায় ঝল্‌মল্ করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে।

সে সাহস কী শব্দনির্বাচনে, কী ছন্দোরচনায়, কী ভাববিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ। সে সাহস আমাদিগকে বারম্বার চকিত করিয়া তুলিয়াছে, আমাদের মনকে শেষ পর্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছে।

কাব্যে যে নয় রস আছে অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাখেন। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্র তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য করুণা মাধুর্য বিস্ময় কখন্ কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে তাহার ঠিকানা নাই।

এইরূপে মন্দ্রকাব্যের প্রায় প্রত্যেক কবিতা নব নব গতিভঙ্গে যেন

নৃত্য করিতেছে, কেহ স্থির হইয়া নাই ; ভাবের অভাবনীয় আবর্তনে তাহার ছন্দ ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার অলংকারগুলি হইতে আলোক ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

কিন্তু নর্তনশীলা নটীর সঙ্গে তুলনা করিলে মন্দ্রকাব্যের কবিতাগুলির ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ, ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। ইহার হাস্য বিষাদ বিদ্রূপ বিস্ময় সমস্তই পুরুষের, তাহাতে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সবলতা আছে। তাহাতে হাবভাব ও সাজসজ্জার প্রতি কোনো নজর নাই।

বরং উপমা দিতে হইলে শ্রাবণের পূর্ণিমারাত্রির কথা পাড়া যাইতে পারে। আলোক এবং অন্ধকার, গতি এবং স্তব্ধতা, মাধুর্য ও বিরাট-ভাব আকাশ জুড়িয়া অনায়াসে মিলিত হইয়াছে। আবার মাঝে মাঝে এক-এক পস্‌লা বৃষ্টিও বাতাসকে আর্দ্র করিয়া ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে ঝরিয়া পড়ে। মেঘেরও বিচিত্র ভঙ্গী— তাহা কখনো চাঁদকে অর্ধেক ঢাকিতেছে, কখনো পূরা ঢাকিতেছে, কখনো বা হঠাৎ একেবারে মুক্ত করিয়া দিতেছে, কখনো বা ঘোরঘটায় বিদ্যুতে স্ফুরিত ও গর্জনে স্তনিত হইয়া উঠিতেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলাভাষার একটা নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের সেই কাজ। ভাষাবিশেষের মধ্যে যে কতটা ক্ষমতা আছে তাহা তাঁহারাই দেখাইয়া দেন ; পূর্বে যাহার অস্তিত্ব কেহ সন্দেহ করে নাই তাহাই তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দেন। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলা কাব্যভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে কেমন অনায়াসে তরল হইতে গম্ভীর ভাষায়, ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে— ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃদুমন্থর আবেশভারাক্রান্ত নহে— তাহা কবি দেখাইয়াছেন।

ছন্দ সম্বন্ধেও যেন স্পর্ধাভরে কবি যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার 'আশীর্বাদ' ও 'উদ্‌বোধন' কবিতায় ছন্দকে একেবারে ভাঙিয়া-চুরিয়া উড়াইয়া দিয়া ছন্দোরচনা করা হইয়াছে। তিনি যেন সাংঘাতিক সংকটের পাশ দিয়া গেছেন— কোথাও যে কিছু বিপদ ঘটে নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই দুঃসাহস কোনো ক্ষমতাহীন কবিকে আদৌ শোভা পাইত না।

এইবার নমুনা উদ্‌ধৃত করিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু আমরা ফুল ছিঁড়িয়া বাগানের শোভা দেখাইবার আশা করি না। পাঠকগণ কাব্য পড়িবেন; কেবল সমালোচনা চাখিয়া ভোজের পূর্ণসুখ নষ্ট করিবেন না।

কার্তিক ১৩০৯

শুভবিবাহ

রাস্কিন এক জায়গায় বলিয়াছেন, 'মহৎ আর্ট্ মাত্রই স্তব।' সেই সঙ্গেই তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে, কোনো বড়ো জিনিসকে সংজ্ঞার দ্বারা বাঁধা সহজ নহে। অতএব, আর্ট্ ব্যাপারটা যে স্তব, সেটা খোলসা করিয়া বোঝানো আবশ্যক।

মানুষ বিশ্বসংসারে যাহা ভালোবাসে আর্টের দ্বারা তাহার স্তব করে। সুন্দর গড়ন দিয়া মানুষ যখন একটা সামান্য ঘট প্রস্তুত করে তখন সে কী করে? না, রেখার যে মনোহর রহস্য আমরা ফুলের পাপড়ির মধ্যে, ফলের পূর্ণতার মধ্যে, পাতার ভঙ্গিমায়, জীবশরীরের লাবণ্যে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, মানুষ ঘটের গঠনে বিশ্বের সেই রেখা-বিন্যাস-চাতুরীর প্রশংসা করে। বলে যে 'জগতে চোখ মেলিয়া এই-সকল বিচিত্র সুষমা আমার ভালো লাগিয়াছে।'

এইখানে একটা কথা ভাবিবার আছে। বিশ্বপ্রকৃতি বা মানবপ্রকৃতির মধ্যে যাহা-কিছু মহৎ বা সুন্দর, তাহাই আমাদের স্তবের যোগ্য, সুতরাং তাহাই আর্টের বিষয়, এ কথা বলিলে সমস্ত কথা বলা হয় না।

প্রাণের প্রতি প্রাণের, মনের প্রতি মনের, হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক টান আছে। ইহাকে বিশেষভাবে সৌন্দর্য বা ঔদার্যের আকর্ষণ বলিতে পারি না। ইহাকে ঐক্যের আকর্ষণ বলা যাইতে পারে। আমি মানুষ, কেবল এইজন্যই মানুষের সকল বিষয়েই আমার মনের একটা ঔৎসুক্য আছে। আমি বাঙালি, এইজন্য বাঙালির তুচ্ছ বিষয়টিতেও আমার মনের মধ্যে একটা সাড়া পাওয়া যায়। গ্রামের দিঘির ভাঙা ঘাটটি আমার ভালো লাগে— সুন্দর বলিয়া নয়, গ্রামকে ভালোবাসি বলিয়া। গ্রামকে কেন ভালোবাসি? না, গ্রামের লোকজনদের প্রতি আমার মনের একটা টান আছে। কিন্তু গ্রামের

লোকেরা যে রামচন্দ্র-যুধিষ্ঠির সীতা-সাবিত্রীর দল তাহা নহে ; তাহারা নিতান্তই সাধারণ লোক ; তাহাদের মধ্যে স্তব করিবার যোগ্য কোনো বিশেষত্বই দেখা যায় না।

যদি কোনো কবি এই ঘাটটির প্রতি তাঁহার অনুরাগ ঠিকমত ব্যক্ত করিয়া কবিতা লিখিতে পারেন তবে সেই কবিতা কেবল যে এই গ্রামের লোকেরই মনে লাগিবে তাহা নহে, সকল দেশেরই সহৃদয় পাঠক এই কবিতার রস উপভোগ করিতে পারিবে। কারণ, যে ভাবটি লইয়া এই কবিতা রচিত তাহা সকল দেশের মানুষের পক্ষেই সমান।

এ কথা সত্য যে, অনেক আর্ট্‌ই, যাহা উদার, যাহা সুন্দর, তাহার প্রতি আমাদের ভক্তি বা প্রীতির প্রকাশ। কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, যাহা সাধারণ, তাহার প্রতি আমাদের মনের সহজ আনন্দ— ইহাও আর্টের বিষয়। যদি তাহা না হইত তবে আর্ট্‌ আমাদের ক্ষতিই করিত। কারণ, কেবলমাত্র বাছাই করিয়া, জগতের যাহা-কিছু বিশেষভাবে সুন্দর, বিশেষভাবে মহৎ, তাহারই প্রতি আমাদের রুচিকে বারংবার প্রবর্তিত করিতে থাকিলে আমাদের একটা রসের বিলাসিতা জন্মায়। যাহা প্রতি দিনের, যাহা চারি দিকের, যাহা হাতের কাছে আছে, তাহা আমাদের কাছে বিস্বাদ হইয়া আসে ; ইহাতে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আমাদের অনুভবশক্তির আতিশয্য ঘটাইয়া আর-সর্বত্র তাহার জড়ত্ব উৎপাদন করা হয়। এইরূপ আর্ট্‌সম্বন্ধীয় বাবুয়ানার দুর্গতির কথা টেনিসন তাঁহার কোনো কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন, সকলেই তাহা জানেন।

আমরা যে গ্রন্থখানির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, পাঠকের সহিত তাহার পরিচয়-সাধন করাইবার আরম্ভে ভূমিকাস্বরূপ উপরের কয়েকটি কথা বলা গেল।

রাস্কিনের সংজ্ঞা অনুসারে 'শুভবিবাহ' বইখানি কিসের স্তব ? ইহার মধ্যে সৌন্দর্যের ছবি, মহত্ত্বের আদর্শ, কী প্রকাশ পাইয়াছে ? ইহার

উত্তরে বলিব, এমন করিয়া হিসাব খতাইয়া দেখা চলে না। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে ঘরের লোক জিজ্ঞাসা করিতে পারে, আজ তুমি কী রোজগার করিয়া আনিলে ? লাভের পরিমাণ তখনি তাহাকে গুনিয়া দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু বন্ধুবান্ধবের বাড়ি ঘুরিয়া আসিলে যদি প্রশ্ন ওঠে 'আজ তুমি কী লাভ করিলে' তবে থলি ঝাড়িয়া তাহা হাতে-হাতে দেখানো সম্ভবপর হইতে পারে না।

সাহিত্যেও কোনো কোনো বিশেষ গ্রন্থে কী পাওয়া গেল তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু এমন গ্রন্থও আছে যাহার লাভ এমন করিয়া হিসাবের মধ্যে আনা যায় না— যাহা নূতন শিক্ষা নহে, যাহা মহান উপদেশ নহে, যাহা অপরূপ সৃষ্টি নহে— যাহা কেবল পরিচিতের সঙ্গে পরিচয়, আলাপীর সঙ্গে আলাপ, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব মাত্র।

কিন্তু জীবনের আনন্দের অধিকাংশই এইরূপ অত্যন্ত সহজ এবং সামান্য জিনিস লইয়াই তৈরি। আকস্মিক, অদ্ভুত, অপূর্ব আমাদের জীবনের পথে দৈবাৎ আসিয়া জোটে ; তাহার জন্য যে বসিয়া থাকে বা খুঁজিয়া বেড়ায় তাহাকে প্রায়ই বঞ্চিত হইতে হয়।

'শুভবিবাহ' একটি গল্পের বই ; স্ত্রীলোকের লেখা। ইহার গল্পের ক্ষেত্রটি কলিকাতা-কায়স্থসমাজের অন্তঃপুর। এটুকু বলিতে পারি, মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিয়াছে এমন কোনো পুরুষ গ্রন্থকার লিখিতে পারিত না।

পরিচয় থাকিলেই তাহার বিষয়ে যে সহজে লেখা যায় এ কথা ঠিক নহে। নিত্যপরিচয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়তা আনে ; মনকে যাহা নূতন করিয়া, বিশেষ করিয়া আঘাত না করে, মন তাহাকে জানিয়াও জানে না। যাহা সুপরিচিত তাহার প্রতিও মনের নবীন ঔৎসুক্য থাকা একটি দুর্লভ ক্ষমতা।

শুভবিবাহে লেখিকা সেই ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন। এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোনো গল্পের বইয়ে আমরা দেখি নাই। গ্রন্থে বর্ণিত অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরিকাগণ যে লেখিকার বানানো, এ কথা আমরা কোনো জায়গাতেই মনে করিতে পারি নাই। তাহারাই দেদীপ্যমান সত্য এবং লেখিকা উপলক্ষ্যমাত্র।

এই বইখানির মধ্যে সামান্য একটুখানিমাত্র গল্প আছে এবং নায়ক নায়িকার উপসর্গ একেবারেই নাই। তবু প্রথম খান-ত্রিশেক পাতা পড়া হইয়া গেলেই মনের ঔৎসুক্য শেষ ছত্র পর্যন্ত সমান সজাগ হইয়া থাকে। অথচ সমস্ত গ্রন্থে কলাকৌশল বা ভাষার ছটা একেবারেই নাই, কেবল জীবন এবং সত্য আছে। যাহা-কিছু আছে সমস্তই সহজেই প্রত্যক্ষ এবং অনায়াসেই প্রত্যয়যোগ্য।

গ্রন্থে বর্ণিত নারীগুলিকে অসামান্যভাবে চিত্র করিবার চেষ্টামাত্র করা হয় নাই, অথচ তাহাদের চরিত্রে আমাদের মনকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাদের সুখদুঃখে আমরা কিছুমাত্র উদাসীন নই। যিনি ঘরের গৃহিণী, এই গ্রন্থের যিনি 'দিদি', তিনি মোটাসোটা, সাদাসিধা, প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক; ছেলের উপার্জিত নূতনলব্ধ ঐশ্বর্যে অহংকৃত; অথচ তাঁহার অন্তঃকরণে যে স্বাভাবিক স্নেহরস সঞ্চিত আছে তাহা বিকৃত হইতে পায় নাই— তিনি উপরে ধনীঘরের কর্ত্রী, ভিতরে সরলহৃদয় সহজ স্ত্রীলোক। তাঁহার বিধবা কন্যা 'রানী' কল্যাণের প্রতিমা, অথচ ইহার চিত্রে সচেষ্টভাবে বেশি করিয়া রঙ ফলাইবার প্রয়াস কোনো জায়গাতেই দেখা যায় না; অতি সহজেই ইনি ইঁহার স্থান লইয়া আছেন, নিতান্ত সামান্য ব্যাপারের মধ্যেই ইনি আপনার অসামান্যতাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। লেখিকা ইঁহাকে আমাদের সম্মুখে খাড়া করিয়া দিয়া বাহবা লইবার জন্য কোথাও আমাদের মুখের দিকে তাকান নাই। আর সেই 'পিসিমা', অনাথা, সন্তানহীনা— জনশূন্য বৃহৎ ঘরে অনাবশ্যক

ঐশ্বর্যের মধ্যে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহটিকে লইয়া যিনি নারীহৃদয়ের সমস্ত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রশান্ত ধৈর্যের সহিত মিটাইতেছেন, তাঁহার চরিত্রে শুভ্র পবিত্রতার সহিত স্নিগ্ধ করুণার, বঞ্চিত স্নেহবৃত্তির সহিত সংযত নিষ্ঠার সুন্দর সমবায় যেন অনায়াসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে কাছে পাইয়া যখন এই তপস্বিনীর স্ত্রীপ্রকৃতি সুধারসে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার দেবসেবার নিত্যকর্মকেও যেন ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেল, তখন আন্তরিক অশ্রুজলে পাঠকের হৃদয় যেন সুস্নিগ্ধ হইয়া যায়।

রোমান্টিক উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে আছে; বাস্তব চিত্রের অত্যন্ত অভাব। এজন্যও এই গ্রন্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম। য়ুরোপীয় সাহিত্যে কোথাও কোথাও দেখিতে পাই, মানবচরিত্রের দীনতা ও জঘন্যতাকেই বাস্তবিকতা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য বাংলা গ্রন্থটিতে পঙ্কিলতার নামগন্ধমাত্র নাই, অথচ বইটির আগাগোড়ায় এমন কিছু নাই যাহা সাধারণ নহে, স্বাভাবিক নহে, বাস্তব নহে।

আষাঢ় ১৩১৩

মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস

আবদুল করিম বি. এ. -প্রণীত

ভারতবর্ষে মুসলমান-প্রবেশের অনতিপূর্বে খৃস্টশতাব্দীর আরম্ভকালে ভারত-ইতিহাসে একটা রোমাঞ্চকর মহাশূন্যতা দেখা যায়। দীর্ঘ দিবসের অবসানের পর একটা যেন চেতনাহীন সুষুপ্তির অন্ধকার সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল— সেটুকু সময়ের কোনো জাগ্রত সাক্ষী, কোনো প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। গ্রীক এবং শক -গণের সহিত সংঘাত তাহার পূর্বেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যে দ্বন্দ্বসংঘাতে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য শালিবাহন সমস্ত ভারতবর্ষের চূড়ার উপরে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন তাহা কেমন করিয়া একেবারে শান্ত, নিরস্ত, নিস্তরঙ্গ হইয়াছিল! নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে কোনো মহৎ ব্যক্তি বা বৃহৎ উদ্‌বোধনের আবির্ভাব হয় নাই। মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস-যবনিকা সবলে ছিন্ন করিয়া উদ্‌ঘাটন করিল তখন রাজপুত-নামক এক আধুনিক সম্প্রদায় দেশের সমুদয় উচ্চ স্থানগুলি অধিকার করিয়া মান-অভিমানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধে দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিতেছিল। সে জাতি কখন গঠিত হইল, কখন প্রবল হইল, কখন পশ্চিম হইতে পূর্বদেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইল, তাহারা কাহাকে দূরীকৃত করিয়া কাহার স্থান অধিকার করিল— তাহা সমস্তই ভারতবর্ষের সেই ঐতিহাসিক অন্ধরজনীর কাহিনী; তাহার আনুপূর্বিকতা প্রচ্ছন্ন। মনে হয় ভারতবর্ষ তদানীং সহসা কোথা হইতে একটা নিষ্ঠুর আঘাত, একটা প্রচণ্ড বেদনা পাইয়া নিঃশব্দমূর্ছিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে আর সে নিজের পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পায় নাই; আর তাহার বীণায় সংগীত বাজে নাই, কোদণ্ডে টংকার জাগে নাই, নির্বাণহোমাগ্নি তপোবনে ঋষিললাট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা উদ্ভাসিত হয় নাই।

এ দিকে অনতিপূর্বে ভারতবর্ষের প্রতিবেশে বহুতর খণ্ডবিচ্ছিন্ন জাতি মহাপুরুষ মহম্মদের প্রচণ্ড আকর্ষণবলে একীভূত হইয়া মুসলমান-নামক এক বিরাট কলেবর ধারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল। তাহারা যেন ভিন্ন ভিন্ন দুর্গম মরুময় গিরিশিখরের উপরে খণ্ড তুষারের ন্যায় নিজের নিকটে অপ্রবুদ্ধ এবং বাহিরের নিকটে অজ্ঞাত হইয়া বিরাজ করিতেছিল। কখন প্রচণ্ড সূর্যের উদয় হইল, এবং দেখিতে দেখিতে নানা শিখর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তুষারস্রুত বন্যা একবার একত্র স্ফীত হইয়া তাহার পরে উন্মত্ত সহস্র ধারায় জগৎকে চতুর্দিকে আক্রমণ করিতে বাহির হইল। তখন শ্রান্ত পুরাতন ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্ম বৌদ্ধদের দ্বারা পরাস্ত, এবং বৌদ্ধধর্ম বিচিত্র বিকৃত রূপান্তরে ক্রমশ পুরাণ-উপপুরাণের শতধাবিভক্ত ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বক্র প্রণালীর মধ্যে স্রোতোহীন মন্দগতিতে প্রবাহিত হইয়া একটি সহস্রলাঙ্গুল শীতরক্ত সরীসৃপের ন্যায় ভারতবর্ষকে শতপাকে জড়িত করিতেছিল। তখন ধর্মে সমাজে শাস্ত্রে কোনো বিষয়ে নবীনতা ছিল না, গতি ছিল না, বৃদ্ধি ছিল না; সকল বিষয়েই যেন পরীক্ষা শেষ হইয়া গেছে, নূতন আশা করিবার বিষয় নাই। সে সময়ে নূতনসৃষ্ট মুসলমান-জাতির বিশ্ববিজয়োদ্দীপ্ত নবীন বল সম্বরণ করিবার উপযোগী কোনো একটা উদ্দীপনা ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল না।

নব ভাবোৎসাহে এবং ঐক্যপ্রবণ ধর্মবলে একটা জাতি যে কিরূপ মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি লাভ করে পরবর্তী কালে শিখগণ তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল।

কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, নিরুৎসুক হিন্দুগণ মরিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মুসলমানেরা যুদ্ধ করিয়াছে, আর হিন্দুরা দলে দলে আত্মহত্যা করিয়াছে। মুসলমানদের যুদ্ধের মধ্যে এক দিকে ধর্মোৎসাহ, অপর দিকে রাজ্য অথবা অর্থ-লোভ ছিল, কিন্তু হিন্দুরা চিতা জ্বালাইয়া, স্ত্রী-কন্যা ধ্বংস করিয়া, আবালবৃদ্ধ মরিয়াছে, মরা উচিত বিবেচনা করিয়া, বাঁচা

তাহাদের শিক্ষাবিরুদ্ধ সংস্কারবিরুদ্ধ বলিয়া। তাহাকে বীরত্ব বলিতে পারো, কিন্তু তাহাকে যুদ্ধ বলে না। তাহার মধ্যে উদ্দেশ্য অথবা রাষ্ট্রনীতি কিছুই ছিল না।

শাস্ত্রের উপদেশেই হউক বা অন্য কোনো ঐতিহাসিক কারণ অথবা জলবায়ুঘটিত নিরুদ্যম-বশতই হউক, পৃথিবীর উপর হিন্দুদের লুব্ধ মুষ্টি অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। জগতের কিছুর উপরে তেমন প্রাণপণ দাবি ছিল না। প্রবৃত্তির সেই উগ্রতা না থাকিলে মাংসপেশীতেও যথোচিত শক্তি জোগায় না। গাছ যেমন সহস্র শিকড় দিয়া মাটি কামড়াইয়া থাকে এবং চারি দিক হইতে রস শুষিয়া টানে, যাহারা তেমনি আগ্রহে জগৎকে খুব শক্ত করিয়া না ধরিতে পারে জগৎও তাহাদিগকে ধরিয়া রাখে না। তাহাদের গোড়া আল্‌গা হয়, তাহারা ঝড়ে উল্‌টাইয়া পড়ে। আমরা হিন্দুরা বিশেষ করিয়া কিছু চাহি না, অন্যের প্রাচীরের সন্ধি বিদীর্ণ করিয়া দূরের দিকে শিকড় প্রসারণ করি না— সেইজন্য যাহারা চায় তাহাদের সহিত পারিয়া উঠা আমাদের কর্ম নহে।

যাহারা চায় তাহারা যে কেমন করিয়া চায়, এই সমালোচ্য গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। পৃথিবীর জন্য এমন ভয়ংকর কাড়াকাড়ি, রক্তপাত, এত মহাপাতক, একত্র আর কোথাও দেখা যায় না। অথচ এই রক্তস্রোতের ভীষণ আবর্তের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে দয়াদাক্ষিণ্য ধর্মপরতা রত্নরাজির ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

য়ুরোপীয় খৃস্টান জাতির মধ্যে এই বিশ্বগ্রাসী প্রবৃত্তিক্ষুধা কিরূপ সাংঘাতিক তাহা সমুদ্রতীরের বিলুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণ ও রক্ত-কায় জাতিরা জানে। রূপকথার রাক্ষস যেমন নাসিকা উদ্যত করিয়া আছে, আমিষের ঘ্রাণ পাইলেই গর্জন করিয়া উঠে 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ', ইহারা তেমনি কোথাও এক টুকরা নূতন জমির সন্ধান পাইলেই দলে দলে চীৎকার করিয়া উঠে 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ মাটির গন্ধ পাঁউ'! উত্তর

আমেরিকার ক্লণ্ডাইক-নামক দুর্গম তুষারমরুর মধ্যে স্বর্ণখনির সংবাদ পাইয়া লোভোন্মত্ত নরনারীগণ দীপশিখালুব্ধ পতঙ্গের মতো কেমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে— পথের বাধা, প্রাণের ভয়, অন্নকষ্ট, কিছুতেই তাহাদিগকে রোধ করিতে পারে নাই— সে বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে সকলেই পাঠ করিয়াছেন। এই-যে অচিন্তনীয় কষ্টসাধন ইহাতে দেশের উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু ইহার লক্ষ্য দেশের উন্নতি, জ্ঞানের অর্জন অথবা আর-কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নহে— ইহার উদ্দীপক দুর্দান্ত লোভ। দুর্যোধন প্রমুখ কৌরবগণ যেমন লোভের প্ররোচনায় উত্তরের গোগৃহে ছুটিয়াছিল ইহারাও তেমনি ধরণীর স্বর্ণরস দোহন করিয়া লইবার জন্য মৃত্যুসংকুল উত্তরমেরুর দিকে ধাবিত হইয়াছে।

অধিক দিনের কথা নহে, ১৮৭১ খৃস্টাব্দে একটি ইংরাজ দাসদস্যু-ব্যবসায়ী জাহাজে কিরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা *The Wide World Magazine* -নামক একটি নূতন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ফিজিদ্বীপে য়ুরোপীয় শস্যক্ষেত্রে মনুষ্য-পিছু তিন পাউন্ড্ করিয়া মূল্য দেওয়া হইত। সেই লোভে একদল দাসচোর যে কিরূপ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত দক্ষিণ সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জে মনুষ্যশিকার করিত এবং একদা ষাট-সত্তর জন বন্দীকে কিরূপ পিশাচের মতো হত্যা করিয়া সমুদ্রের হাঙর দিয়া খাওয়াইয়াছিল, তাহার নিদারুণ বিবরণ পাঠ করিলে খৃস্টান মতের 'অনন্ত নরক' দণ্ডে বিশ্বাস জন্মে।

যে-সকল জাতি বিশ্ববিজয়ী, যাহাদের অসন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই, তাহাদের সভ্যতার নিম্নকক্ষে শৃঙ্খলবদ্ধ হিংস্রতা ও উচ্ছৃঙ্খল লোভের যে একটা পশুশালা গুপ্ত রহিয়াছে, মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাইলে কণ্টকিত হইতে হয়।

তখন আমাদের মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের উদয় হয় যে, যে বৈরাগ্য ভারতবর্ষীয় প্রকৃতিকে পরের অন্নে হস্তপ্রসারণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া

রাখিয়াছে, দুর্ভিক্ষের উপবাসের দিনেও যাহা তাহাকে শান্তভাবে মরিতে দেয়, তাহা স্বার্থরক্ষা আত্মরক্ষার পক্ষে উপযোগী নহে বটে— তথাপি যখন মুসলমানদের ইতিহাসে দেখি উদ্দাম প্রবৃত্তির উত্তেজনার সম্মুখে, ক্ষমতালাভ স্বার্থসাধন সিংহাসনপ্রাপ্তির নিকটে, স্বাভাবিক স্নেহ দয়া ধর্ম সমস্তই তুচ্ছ হইয়া যায়— ভাই-ভাই পিতা-পুত্র স্বামী-স্ত্রী প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে বিদ্রোহ বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা রক্তপাত এবং অকথ্য অনৈসর্গিক নির্মমতার প্রাদুর্ভাব হয়— যখন খৃস্টান-ইতিহাসে দেখা যায় আমেরিকায় অস্ট্রেলিয়ায় মাটির লোভে অসহায় দেশবাসীদিগকে পশুদলের মতো উৎসাদিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, লোভান্ধ দাসব্যবসায়ীগণ মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে নাই— যখন দেখিতে পাই পৃথিবীটাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নিজের কবলে পুরিবার জন্য সর্বপ্রকার বাধা অমান্য করিতে মানুষ প্রস্তুত, ক্লাইভ হেষ্টিংস্ তাহাদের নিকট মহাপুরুষ এবং সফলতালাভ রাজনীতির শেষ নীতি— তখন ভাবি, শ্রেয়ের পথ কোন্ দিকে। যদিও জানি যে বল পশুত্বকে উত্তেজিত করে সেই বল সময়ক্রমে দেবত্বকে উদ্‌বোধিত করে, জানি যেখানে আসক্তি প্রবল সেইখানেই আসক্তিত্যাগ সুমহৎ, জানি বৈরাগ্যধর্মের ঔদাসীন্য যেমন প্রকৃতিকে দমন করে তেমনি মনুষ্যত্বে অসাড়তা আনে এবং ইহাও জানি অনুরাগধর্মের নিম্নস্তরে যেমন মোহান্ধকার তেমনি তাহার উচ্চশিখরে ধর্মের নির্মলতম জ্যোতি, জানি যেখানে মনুষ্যপ্রকৃতির বলশালিতা-বশত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংঘর্ষ প্রচণ্ড সেইখানেই দেবগণের ভোগে বিশুদ্ধতম আধ্যাত্মিক অমৃত উন্মথিত হইয়া উঠে— তথাপি লোভের হিংসার ভীষণ আন্দোলন এবং বিলাসলালসার নিয়তচাঞ্চল্যের দৃষ্টান্ত দেখিলে ক্ষণকালের জন্য দ্বিধা উপস্থিত হয়; মনে সন্দেহ জাগে যে, পাপপুণ্যের ভালোমন্দের এইরূপ উত্তুঙ্গতরঙ্গিত অসাম্য শ্রেয়, না অপাপের অমন্দের একটি নির্জীব সুবৃহৎ সমতল নিশ্চলতা শ্রেয়! শেষের দিকেই আমাদের অন্তরের আকর্ষণ— কারণ, বিরাট

সংগ্রামের উপযোগী বল আমরা অন্তঃকরণের মধ্যে অনুভব করি না ; ধর্ম এবং অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই সব ক'টাকে একত্র চালনা করিবার মতো উদ্যম আমাদের নাই ; আমরা সর্বপ্রকার দুরন্ত চেষ্টাকে নিবৃত্ত করিয়া সম্পূর্ণ শান্তিলাভ করিবার প্রয়াসী। কিন্তু শাস্ত্রে যখন ভারতবর্ষকে দুর্গপ্রাচীরের মতো রক্ষা করিতে পারে না, পরজাতির সংঘাত যখন অনিবার্য, যখন লোভের নিকট হইতে স্বার্থরক্ষা এবং হিংসার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে আমরা বাধ্য, তখন মানবের মধ্যে যে দানবটা আছে সেটাকে সকালে সন্ধ্যায় আমিষ খাওয়াইয়া, কিছু না হউক, দ্বারের বাহিরেও প্রহরীর মতো বসাইয়া রাখা সংগত। তাহাতে আর কিছু না হউক, বলশালী লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

কিন্তু হায়, ভারতবর্ষে দেবদানবের যুদ্ধে দানবগুলো একেবারেই গেছে— দেবতারাও যে খুব সজীব আছেন তাহা বোধ হয় না। অন্তত সর্বপ্রকার শঙ্কা ও দ্বন্দ্ব -শূন্য হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রাবণ ১৩০৫

সাকার ও নিরাকার

সাকার ও নিরাকার-তত্ত্ব। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি. এ. -প্রণীত

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এইরূপ তর্ক মধ্যে মধ্যে আমাদের দেশে শুনা যায়। কিন্তু বর্তমান সমালোচ্য গ্রন্থে তর্কটা তত দূর স্থূল নহে। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, ঈশ্বরকে সাকার ভাবে উপাসনা করিতে হইবে কি নিরাকার ভাবে।

কেহ কেহ এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন যে, যে লোক নিরাকারে মন দিতে পারে না তাহার পক্ষে সাকার-উপাসনা শ্রেয়।

কিন্তু গ্রন্থকার সেরূপ মাঝামাঝি কিছু বলিতে চাহেন না, তিনি বলেন, নিরাকার-উপাসনা হইতেই পারে না। হয় সোঽহংব্রহ্ম হইয়া যাও নয় মূর্তিপূজা করো। তিনি কালাপাহাড়ের ঠিক বিপরীতমুখে সংহারকার্য শুরু করিয়াছেন। মূর্তিপূজাকে কেবল যে তিনি রক্ষা করিতে চান তাহা নহে, অমূর্তপূজাকে তর্কের দ্বারা ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন।

কী হইতে পারে এবং কী হইতে পারে না, তর্ক অপেক্ষা ইতিহাসে তাহার প্রমাণ সহজে পাওয়া যায়। জল যে শীতে জমিয়া বরফ হইতে পারে, উষ্ণপ্রধান দেশের রাজাকে তাহা তর্কে বুঝানো অসাধ্য ; কিন্তু যদি তিনি একবার নড়িয়া হিমালয়প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া আসেন তবে এ সম্বন্ধে আর কথা থাকে না। লেখকমহাশয় সে রাস্তায় যান নাই, তিনি তর্কদ্বারা বলিয়াছেন নিরাকার-উপাসনা হইতেই পারে না।

মুসলমানেরা মূর্তিপূজা করে না। অথচ মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্ত কেহ নাই বা কখনও জন্মেন নাই, এ কথা বিশ্বাস্য নহে। কী করিয়া যে তাঁহাদের ভক্তিবৃত্তির পরিতৃপ্তি হয় তাহা যতীন্দ্রমোহনবাবু না বুঝিতে পারেন, কিন্তু মূর্তিপূজা করিয়া নহে এ কথা নিশ্চয়।

নানক যে জগতের ভক্তশ্রেষ্ঠদের মধ্যে একজন নহেন তাহা কেহ সাহস করিয়া বলিবেন না। তিনি যে সোহহংব্রহ্মবাদী ছিলেন না, ইহাও নিঃসন্দেহ। তিনি যে প্রচলিত মূর্তি-উপাসনা বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া অমূর্ত-উপাসনা প্রচার করিয়াছেন, ইহার একটি বৈ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিশ্চয় তিনি নিরাকার-উপাসনায় চরিতার্থতা লাভ করিতেন এবং মূর্তি-উপাসনায় তাহার ব্যাঘাত করিয়াছিল।

ব্রাহ্মদের মধ্যেও নিঃসন্দেহ কেহ না কেহ আছেন যিনি প্রবলভক্তির আবেগ-বশতই মূর্তিপূজা পরিহার-পূর্বক সমস্ত জীবন নিরাকার-উপাসনায় যাপন করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে তিনি ভ্রান্ত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে ভক্ত তাহা কেবল তর্কে নহে, আচরণে এবং বহু পীড়ন ও ত্যাগ-স্বীকারে প্রমাণ করিয়াছেন।

এক কালে ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা ছিল না। কিন্তু সেই দূর কাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ উত্থাপন করা নিষ্ফল। আধুনিক কালের যে-কয়টি উদাহরণ দেওয়া গেল তাহা হইতে অন্তত এইটুকু প্রমাণ হয় যে, কোনো কোনো ভক্ত মূর্তিপূজায় বিরক্ত হইয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছেন এবং অনেক ভক্ত পৃথিবীর অনেক দেশে অমূর্ত-উপাসনায় ভক্তিবৃত্তির পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

গ্রন্থকার বলেন, 'মানিলাম তাঁহারা মূর্তিপূজা করেন না, কিন্তু তাঁহারা নিরাকার-উপাসনা করেন ইহা হইতেই পারে না।' কারণ, 'জাতিবাচক ও গুণবাচক পদার্থের জ্ঞান সাকার।' এবং 'জাতিবাচক ও গুণবাচক পদার্থ অবলম্বনে ঈশ্বরের জ্ঞান সাকার।'

এ কেমন তর্ক? যেমন— যদি আমি বলি 'ক বাঁকা পথে চলে এবং খ সোজা পথে চলে' তুমি বলিতে পারো, 'খও সোজা পথে চলে না, কারণ সরল রেখা কাল্পনিক, পৃথিবীতে কোথাও সরল রেখা নাই।'

কথাটা সত্য বটে, কিন্তু তথাপি ইহা তর্কমাত্র। আমাদের ভাষা আমাদের মনকে এক-দম ছাড়াইয়া যাইতে পারে না এবং আমাদের মন সীমাবদ্ধ। সুতরাং আমাদের ভাষা আপেক্ষিক। আমরা যাহাকে তীক্ষ্ণ বলি অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে তাহা ভোঁতা হইয়া পড়ে, আমরা যাহাকে নিটোল গোল বলি তাহাকে সহস্রগুণ বাড়াইয়া দেখিলে তাহার অসমানতা ধরা পড়িয়া যায়। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে নিরাকার-উপাসনার মধ্যে যে আকারের আভাস পাওয়া যায় না তাহা বলিতে সাহস করি না।

তাই যদি হইল, তবে আমরা যাহাকে সাকার-উপাসনা বলি তাহাতেই বা দোষ কী? নিরাকার যখন পূর্ণভাবে মনের অগম্য তখন তাঁহাকে সুগম আকারে পূজা করাই ভালো।

আকার আমাদের মনের পক্ষে সুগম হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া নিরাকার যে আকারের দ্বারা সুগম হইতে পারেন তাহা নহে— ঠিক তাহার উল্‌টা।

মনে করো, আমি সমুদ্রের ধারণা করিতে ইচ্ছা করি। সমুদ্র ক্রোশ দুই তফাতে আছে। আমি তাহা দেখিতে যাত্রা করিবার সময় পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, 'সমুদ্র এতই বড়ো যে স্বচক্ষে দেখিয়াও তাহার ধারণা হইতে পারে না, কারণ আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ— আমরা সমুদ্রের মধ্যে যতই দূরে যাই, যতই প্রয়াস পাই, সমুদ্রকে ছোটো করিয়া দেখা ছাড়া উপায়ই নাই। অতএব, তোমার অন্দরের মধ্যে একটি ছোটো ডোবা খুঁড়িয়া তাহাকে সমুদ্র বলিয়া কল্পনা করো।'

কিন্তু দর্শনশক্তির সাধ্যসীমা-দ্বারা সমুদ্র দেখিয়াও যদি সমুদ্রের ধারণা সম্পূর্ণ না হয় তবে ডোবা হইতে সমুদ্রের ধারণা অসম্ভব বলিলেও হয়।

অনন্ত আকাশ আমাদের কাছে মণ্ডলবদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে দ্বার বদ্ধ করিয়া আকাশ দেখার সাধ মিটাইতে পারি না। আমি যত দূর

পর্যন্ত দেখিতে পাই তাহা না দেখিয়া আমার তৃপ্তি হয় না।

এই-যে প্রয়াস বস্তুত ইহাই উপাসনা। আমার শেষ পর্যন্ত গিয়াও যখন তাঁহার শেষ পাই না— আমার মন যখন একাকী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাত্রা করিয়া বাহির হয়, যখন অগণ্য গ্রহ চন্দ্র তারকা অনন্ত জটিল জ্যোতিররণ্য-মধ্যে সে হারাইয়া যায় এবং প্রভাতকরপ্লাবিত নীলাকাশের মহোচ্চ দেশে বিলীনপ্রায় বিহঙ্গমের মতো উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে গাহিয়া উঠে 'তুমি ভূমা, আমি তোমার শেষ পাইলাম না', তখন তাহাতেই সে কৃতার্থ হয়। সেই অন্ত না পাইয়াই তাহার সুখ। ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

টলেমির জগৎতন্ত্র আমাদের ধারণাযোগ্য। পৃথিবীকে মধ্যে রাখিয়া বদ্ধ কঠিন আকাশে জ্যোতিষ্কগণ সংকীর্ণ নিয়মে ঘুরিতেছে, ইহা ঠিক মনুষ্যমনের আয়ত্তগম্য। কিন্তু অধুনা জ্যোতির্বিদ্যার বন্ধনমুক্তি হইয়াছে, সে সীমাবদ্ধ ধারণার বাহিরে অনন্ত রহস্যের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাহার গৌরব বাড়িয়াছে। জগৎটা যে পৃথিবীর প্রাঙ্গণমাত্র নহে, পৃথিবী যে বিশ্বজগতে ধূলিকণার অধম, এই সংবাদেই আমাদের কল্পনা প্রসারিত হইয়া যায়।

আমাদের উপাস্য দেবতাকেও যখন কেবলমাত্র মনুষ্যের গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে বদ্ধ করিয়া না দেখি, তাঁহাকে আমাদের ধারণার অতীত বলিয়া জানি, যখন ঋষিদের মুখে শুনি—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন

অর্থাৎ, মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে সেই আনন্দকে, সেই ব্রহ্মকে, যিনি জানেন তিনি কাহা হইতেও ভয় পান না— তখনি আমাদের বদ্ধ হৃদয় মুক্তির আশ্বাস লাভ করিতে থাকে। বাক্য-মন যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে তিনি যে আমাদের পক্ষে

শূন্যস্বরূপ তাহা নহে, তিনিই আনন্দ।

৫ যাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা বড়ো বলিয়া জানি তাঁহাকেই উপাসনা করি। আমাদের সর্বোচ্চ উপাসনা তিনিই আকর্ষণ করেন যিনি এত বড়ো যে কোথাও তাঁহার শেষ নাই।

তর্কের মুখে বলা যাইতে পারে, তাঁহাকে জানিব বড়ো করিয়া, কিন্তু দেখিব ছোটো করিয়া। আপনাকে আপনি খণ্ডন করিয়া চলা কি সহজ কাজ? বিশেষত ইন্দ্রিয় প্রশ্রয় পাইলে সে মনের অপেক্ষা বড়ো হইয়া উঠে। সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্য যতটুকু না লইলে নয় তদপেক্ষা বেশি কর্তৃত্ব তাহার হাতে স্বেচ্ছাপূর্বক সমর্পণ করিলে মনের জড়ত্ব অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

তাঁহাকে ছোটো করিয়াই বা দেখিব কেন?

নতুবা তাঁহাকে কিছু-একটা বলিয়া মনে হয় না, তিনি মন হইতে ক্রমশ স্খলিত হইয়া পড়েন।

কিন্তু মহৎ লক্ষ্যের জন্য ফাঁকি দিয়া সারিবার সংক্ষিপ্ত রাস্তা নাই। দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। সেই দুর্গম পথ এড়াইবার উপায় থাকিলে ভাবনা ছিল না। কষ্ট করিতে হয়, চেষ্টা করিতে হয় বলিয়া বিনা প্রয়াসের পথ অবলম্বন করিলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যায়। যে লোক ধনী হইতে চায় সে সমস্ত দিন খাটিয়া রাত্রি একটা পর্যন্ত হিসাব মিলাইয়া তবে শুইতে যায়; পায়ের উপর পা দিয়া তাহার অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। আর যে ঈশ্বরকে চায়, পথ দুর্গম বলিয়া সে কি খেলা করিয়া তাঁহাকে পাইবে?

আসল কথা, ঈশ্বরকে সকলে চায় না, পারমার্থিক দিকে স্বভাবতই অনেকের মন নাই। ধন ঐশ্বর্য সুখ সৌভাগ্য পাপক্ষয় এবং পুণ্য-অর্জনের দিকে লক্ষ রাখিয়া দেবসেবা ও ধর্মকর্ম করাকেই জর্জ এলিয়ট other-worldliness নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ সেটা পারলৌকিক বৈষয়িকতা, তাহা আধ্যাত্মিকতা নহে। যাহাদের সেই দিকে লক্ষ

সাকার নিরাকার তাহাদের পক্ষে উপলক্ষ্য মাত্র। সুতরাং হাতের কাছে যেটা থাকে, যাহাতে সুবিধা পায়, দশজনে যেটা পরামর্শ দেয়, তাহাই অবলম্বন করিয়া ধর্মচতুর লোক পুণ্যের খাতায় লাভের অঙ্ক জমা করিতে থাকেন। নিরাকারবাদী এবং সাকারবাদী উভয় দলেই তেমন লোক ঢের আছে।

কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যাঁহাদের প্রকৃতির সহজ ধর্ম, সংসার যাঁহাদিগকে তৃপ্ত ও বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না, যে দিকেই স্থাপন কর কম্পাসের কাঁটার মতো যাঁহাদের মন এক অনির্বচনীয় চুম্বক-আকর্ষণে অনন্তের দিকে আপনি ফিরিয়া দাঁড়ায়, জগদীশ্বরকে বাদ দিলে যাঁহাদের নিকট আমাদের স্থিতিগতি চিন্তাচেষ্টা ক্রিয়াকর্ম একেবারেই নিরর্থক এবং সমস্ত জগদ্‌ব্যাপার নিরবচ্ছিন্ন বিভীষিকা, যাঁহারা অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ আনন্দ উপভোগ করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন যে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'— সাধনা তাঁহাদের নিকট দুঃসাধ্য নহে এবং তাঁহারা আপনাকে এবং আপনার ঈশ্বরকে ভুলাইয়া সংক্ষেপে কার্যোদ্ধার করিতে চাহেন না— কারণ, নিত্যসাধনাতেই তাঁহাদের সুখ, নিয়তপ্রয়াসেই তাঁহাদের প্রকৃতির পরিতৃপ্তি।

সেইরূপ কোনো স্বভাবভক্ত যখন মূর্তিপূজার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি আপন অসামান্য প্রতিভা-বলে মূর্তিকে অমূর্ত করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহার প্রত্যক্ষবর্তী কোনো সীমা তাঁহাকে অসীমের নিকট হইতে কাড়িয়া রাখিতে পারে না; তাঁহার চক্ষু যাহা দেখে তাঁহার মন তাহাকে বিদ্যুদ্‌বেগে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়; বাহিরের উপলক্ষ্য তাঁহার নিকট কেবল অভ্যাসক্রমে থাকে মাত্র, তাহাকে দূর করিবার কোনো প্রয়োজন হয় না; বিশ্বসংসারই তাঁহার নিকট রূপক, প্রতিমার তো কথাই নাই— যে লোকের অক্ষরজ্ঞান আছে সে যেমন অক্ষরকে অক্ষর-

রূপে দেখে না, সে যেমন কাগজের উপর যখন 'গা' এবং 'ছ' দেখে তখন ক্ষুদ্র গ'এ আকার ছ দেখে না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনশ্চক্ষে শাখাপল্লবিত বৃক্ষ দেখিতে পায়, তেমনি তিনি সম্মুখে স্থাপিত বস্তুকে দেখিয়াও দেখিতে পান না, মুহূর্তমধ্যে অন্তঃকরণে সেই অমূর্ত আনন্দ উপলব্ধি করেন 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। কিন্তু এই ইন্দ্রজাল অসামান্য প্রতিভার দ্বারাই সাধ্য। সে প্রতিভা চৈতন্যের ছিল, রামপ্রসাদ সেনের ছিল।

আবার প্রকৃতিভেদে কোনো কোনো স্বভাবভক্ত লোক প্রচলিত মূর্তি-দ্বারা ঈশ্বরের পূজাকে আত্মাবমাননা এবং পরমাত্মাবমাননা বলিয়া অভ্যাস-বন্ধন ছেদন করিয়া আত্মার মধ্যে এবং বিশ্বের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করেন। মহম্মদ এবং নানক তাহার দৃষ্টান্ত।

কিন্তু আমাদের মধ্যে ভক্তির প্রতিভা খুব অল্প লোকেরই আছে। প্রত্যক্ষ সংসার-অরণ্য আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে ; মাঝে মাঝে তাহারই ডালপালার অবকাশ-পথে অধ্যাত্মরশ্মি দেবদূতের তর্জনীর মতো আমাদের অন্ধকারের একাংশ স্পর্শ করিয়া যায়। এখন, আমরা যদি মাঝে মাঝে সংসারের বনচ্ছায়াতলে কীটানুসন্ধান ছাড়িয়া দিয়া অনন্ত আকাশের মধ্যে মুক্তির আনন্দ ভোগ করিতে চাই তো কী করিব।

'যদি চাই' এ কথা বলিতে হইল। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা সকলে চাই না, ঈশ্বরকে উপলক্ষ্য করিয়া আর-কিছু চাই। কিন্তু যদি চাই তো কী করিব ?

তবে যাহাতে বাধা, যাহাতে অন্ধকার, তাহা সাবধানে এড়াইয়া যে দিকে আলোক আপনাকে প্রকাশ করে সেই পথ দিয়া পাখা মেলিয়া আকাশের দিকে উড়িতে হইবে। সে পথ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের পথ, ধূলির পথ, পৃথিবীর পথ নহে ; তাহা পদচিহ্নহীন বায়ুর পথ, আলোকের পথ,

আকাশের পথ। আমাদের পক্ষে সেই এক পথ।

যাঁহারা মুক্তক্ষেত্রে বাস করেন তাঁহারা মাটিতে বসিয়াও আকাশের আলো পান, কিন্তু যাহারা জটিল প্রবৃত্তিজালে পরিবৃত হইয়া আছে তাহাদিগকে একেবারে পৃথিবীর দিক হইতে উড়িয়া বাহির হইয়া যাইতে হয়।

তাহা না করিয়া আমরা যদি আমাদেরই প্রবৃত্তি আমাদেরই আকৃতি দিয়া দেবতা গড়ি তবে তাহার মধ্যে মুক্তি কোন্‌খানে! যদি তাহাকে স্নান করাই, খাওয়াই, মশারিতে শোওয়াই, এমন-কি তাহার জন্য নটী নিযুক্ত করিয়া রাখি, তবে তাহার ফল কী হয়? তবে নিজের প্রবৃত্তিকেই দেবতা করিয়া পূজা করা হয়। আমাদের লোভ, আমাদের হিংসা, আমাদের ক্ষুদ্রতাকে দেবতারূপে অমর করিয়া রাখি। এই কারণেই কালীকে দস্যু আপন দস্যুবৃত্তির সহায় বলিয়া জ্ঞান করে, মিথ্যা-শপথ-কারী আদালতে জয়লাভের জন্য পশু মানত করে, এমন-কি যে-সকল অন্যায় অবিচার দুষ্কর্ম মনুষ্যলোকে গর্হিত বলিয়া খ্যাত দেবচরিত্রে তাহাও অনিন্দনীয় বলিয়া স্থান পায়।

আমাদের দেশের দেবতা কি কেবল মূর্তিতেই বদ্ধ যে রূপক ভাঙিয়া তাহার মধ্যে আমরা ভাবের স্বাধীনতা লাভ করিব? চার হাতকে যেন আমরা চারি-দিক্‌-বর্তী কর্মশীলতা বলিয়া মনে করিলাম, কিন্তু পুরাণে-উপপুরাণে যাত্রায়-কথকতায় তাঁহার জন্মমৃত্যুবিবাহ রাগদ্বেষ সুখদুঃখ দৈন্যদুর্বলতার বিচিত্র পাঠ ও পাঠান্তর হইতে মনকে মুক্ত করিব কেমন করিয়া? যত প্রকার কৌশলে মানুষের মনকে ভুলাইয়া একেবারে আটে-ঘাটে বাঁধা যায় তাহার কোনোটারই ত্রুটি নাই। এবং এত-প্রকার সুদৃঢ় স্থূল শৃঙ্খলে চতুর্দিক হইতে সযত্ন বন্ধনকে গ্রন্থকার যদি তাঁহার নির্‌গুণব্রহ্মলাভের সোপান বলিয়া গণ্য করেন তবে মাছির পক্ষে মাকড়বার জালে পড়াই আকাশে উড়িবার উপায় মনে করা অসংগত

হইবে না।

দেবচরিত্র সম্বন্ধে যে-সকল ভ্রষ্ট আদর্শের কল্পনা আমাদের দেশে শাখাপল্লবিত হইয়া চারি দিকে শিকড় বিস্তার করিয়াছে তাহা কল্পনার বিকার ; গ্রন্থকার বোধ করি তাহা হিন্দুসমাজের অধোগতির ফল বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সম্ভবত তাহা সংশোধন করিয়া লইতে উপদেশ দেন। সংশোধনের উপায় কী ? তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন, 'সকল শাস্ত্রের মূলে এক বেদ, এক শ্রুতি— এক শ্রুতির দ্বারা সকল শাস্ত্রের বিরোধ ভঞ্জন করিবার বিধি রহিয়াছে।'

বিধি রহিয়াছে, কিন্তু কেহ কখনো চেষ্টা করিয়াছেন ? পৌরাণিক ধর্মের সহিত বৈদিক ধর্মের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া কোনো পণ্ডিত আজ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের একটা অখণ্ড আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন কি ? ইহা কি সকলের দ্বারা সাধ্য ?

পৌরাণিক ধর্ম ঐতিহাসিক হিন্দুধর্ম। কালক্রমে হিন্দুর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বৈদিক আর্যগণ যে সমাজ, যে রীতি, যে বিশ্বাস, যে মানসিক প্রকৃতি লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, অনার্যদের সংঘর্ষে, মিশ্রণে, বিচিত্র অবস্থান্তরে, স্বভাবের নিয়মে ক্রমশই তাহা রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই-সকল নব নব অভিব্যক্তি নব নব পুরাণে আপনাকে আকারবদ্ধ করিয়াছে। বেদ যে অবস্থার শাস্ত্র, পুরাণ সে অবস্থার শাস্ত্র নহে। সুতরাং বেদকেই যদি প্রমাণ বলিয়া মানা যায় তবে পুরাণকে ছাড়িতে হয় এবং পুরাণকে প্রবল বলিয়া মানিলে বেদকে পরিহার করিতে হয়। এমন-কি, গ্রন্থকার নিজে বলিয়াছেন এবং ফলেও দেখা যায়, এক পুরাণকে মানিলে অন্য পুরাণের সহিত বিরোধ বাধিয়া উঠে। বর্তমানে হিন্দুসমাজ বেদকে মুখে মান্য করিয়া কাজের বেলা পুরাণকে অবলম্বন করে। উভয়ের মধ্যে যে কোনোপ্রকার অসামঞ্জস্য আছে সে তর্ক উত্থাপিত হয় না।

হিন্দুধর্মের এই ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। কারণ, পুরাণ কেবল সংস্কৃত ভাষায় বদ্ধ নহে, প্রচলিত ভাষাতেও রচিত হয়। মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। মেয়েদের ব্রতকথাও তাহার উদাহরণ। অন্নদামঙ্গলে যদিও পৌরাণিক শিবদুর্গার লীলা বর্ণিত এবং যদিও তাহার রচয়িতা ভারতচন্দ্র শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তথাপি তাহার মধ্যে জনসাধারণ-প্রচলিত আধুনিক কল্পনাবিকার সহজেই স্থানলাভ করিয়াছে। কবিকঙ্কণচণ্ডীতেও তাহাই। হরপার্বতীর কোন্দল, কোঁচ-নারীদের প্রতি শিবের আসক্তি, নিজের গাত্রমল দিয়া দুর্গাকর্তৃক খেলার পুত্তলি-নির্মাণ ও তাহা হইতে গণেশের জন্ম, এ-সমস্ত কাহিনী আধুনিক, প্রাদেশিক ; শ্রুতি ইহার মূল নহে, লোকের কল্পনাই ইহার মূল, দেবতাকে নিজ পরিমাপে নির্মাণ-চেষ্টাই ইহার প্রধান কারণ। ইহার মধ্যে উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক রূপক বাহির করা সাধারণ লোকের পক্ষে অসাধ্য এবং অসাধারণ লোকের পক্ষেও দুঃসাধ্য।

সংক্ষেপে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, যে-সকল ভক্ত মহাপুরুষ চিরপ্রথাগত সাকার উপাসনা ত্যাগ করেন নাই তাঁহারা অসামান্য প্রতিভাবলে উদ্দীপ্ত ভাবাবেগে দৃষ্টিগোচরকেও দৃষ্টিপথাতীত করিয়া তুলিয়াছেন ; বাধা তাঁহাদের নিকট বাধা নহে, র‍্যণ্টগেন-আবিষ্কৃত রশ্মির ন্যায় তাঁহাদের মন শতপ্রাচীরবেষ্টিত জড়-আবরণ অনায়াসে ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে বাধা যে বাধা তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের মনের স্বাভাবিক জড়ত্ব জড়কে আশ্রয় করিতে চায়, তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা তাহা-দিগকে অগ্রসর করে না, বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। ইহা দ্বারা সে ভক্তিসুখ লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহা মুক্তিসুখ নহে।

সকল সম্প্রদায়েরই অধিকাংশ লোক সমাজের অনুসরণে অভ্যস্ত

আচার পালন করেন। ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকে নিয়মিত কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করেন এবং শব্দ শুনিয়া যান, এবং মূর্তি-উপাসকদের অনেকে বাহিক পূজা ও মৌখিক জপ করিয়া কর্তব্য সারিয়া দেন। কিন্তু যাঁহারা কেবল সামাজিক ব্রাহ্ম নহেন, আধ্যাত্মিক ব্রাহ্ম, তাঁহাদের উপাসনাকে গ্রন্থকার যেরূপ উদ্‌ভ্রান্ত মনে করেন তাহা সেরূপ নহে।

আশ্বিন ১৩০৫

জুবেয়ার

রসজ্ঞ ম্যাথ্যু আর্নল্‌ড্‌ ফরাসি ভাবুক জুবেয়ারের সহিত ইংরাজি পাঠকদের পরিচয় করাইয়া দেন।

যখন যাহা মনে আসিত জুবেয়ার তাহা লিখিতেন, কিন্তু প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার রচনা প্রবন্ধরচনা নহে, এক-একটি ভাবকে স্বতন্ত্র-রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা। পদ্যে যেমন সনেট, যেমন শ্লোক, গদ্যে এই লেখাগুলি তেমনি।

জুবেয়ারের বাক্সে দেরাজে এই লেখা কাগজ-সকল স্তূপাকার হইয়াছিল; তাঁহার মৃত্যুর চৌদ্দ বৎসর পরে এগুলি ছাপা হয়, তাহাও পাঠক-সাধারণের জন্য নহে, কেবল বাছা বাছা অল্প গুটিকয়েক সমজদারের জন্য।

জুবেয়ার নিজের রচনার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'আমি কেবল বপন করি, নির্মাণ বা পত্তন করি না।' অর্থাৎ, তিনি ভাবগুলিকে পরস্পর গাঁথিয়া কিছু-একটা বানাইয়া তোলেন না, সজীব ভাবের বীজকে এক-একটি করিয়া রোপণ করেন।

কোনো কোনো মনীষী আপনার মনটিকে ফলের বাগান করিয়া রাখেন, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ চিন্তা ও চর্চার দ্বারা চিত্তকে আবৃত করেন, চতুর্দিকের নিত্যবীজবর্ষণ তাঁহাদের মনের মধ্যে অনাহূত ও অবারিত ভাবে স্থান পায় না।

জুবেয়ারের মন সে শ্রেণীর ছিল না, তাঁহার চিত্ত ফলের বাগান নহে, ফসলের ক্ষেত্র। সে ফসল নানাবিধ। ধর্ম কর্ম কলারস সাহিত্য কত-কী তাহার ঠিক নাই।

অদ্য আমরা সাহিত্য ও রচনাকলা সম্বন্ধে এক অঞ্জলি সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি।—

জুবেয়ার নিজের সম্বন্ধে বলেন, 'যাহা জানিবার ইচ্ছা ছিল তাহা শিক্ষা করিতে বৃদ্ধবয়সের প্রয়োজন হইল, কিন্তু যাহা জানিয়াছি তাহা ভালোরূপে প্রকাশ করিতে যৌবনের প্রয়োজন অনুভব করি।'

অর্থাৎ জ্ঞানের জন্য চেষ্টাজাত অভিজ্ঞতা চাই, কিন্তু প্রকাশের জন্য নবীনতা আবশ্যক। লেখার বিষয়টির মধ্যে চিন্তার পরিচয় যত থাকে ততই তাহার গৌরব বাড়ে, কিন্তু রচনার মধ্যে চেষ্টার লক্ষণ যত অল্প থাকিবে তাহার প্রকাশশক্তি ততই অধিক হইবে।

জুবেয়ার নিজে যে রচনাকলা অবলম্বন করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বলিতেছেন, 'তোমরা কথার ধ্বনির দ্বারা যে ফল পাইতে চাও আমি কথার অর্থ-দ্বারা সেই ফল ইচ্ছা করি; তোমরা কথার প্রাচুর্যের দ্বারা যাহা চাও আমি কথার নির্বাচনের দ্বারা তাহা চাই; তোমরা কথার সংগতির দ্বারা যাহা চাও আমি কথার পৃথক্‌করণের দ্বারা তাহা লাভ করিতে প্রয়াসী। অথচ সংগতিও (harmony) ইচ্ছা করি, কিন্তু তাহা স্বভাবসিদ্ধ যথাযোগ্য সংগতি; জোড়া-গাঁথার নৈপুণ্যমাত্রের দ্বারা যে সংগতি রচিত তাহা চাই না।'

বস্তুত প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ও লিপিকুশল লেখকের প্রভেদ এই যে, একজনের রচনায় সংগতি এমন স্বাভাবিক এবং অখণ্ড যে তাহা বিশ্লেষণ করাই শক্ত, অপরের রচনার সংগতি ইঁটের উপর ইঁটের ন্যায় গাঁথা ও সাজানো। প্রথমটি অজ্ঞাতসারে মুগ্ধ করে, দ্বিতীয়টি বিন্যাসনৈপুণ্যে বাহবা বলায়।

তর্কযুদ্ধ সম্বন্ধে জুবেয়ার বলেন, 'তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা যতটুকু তাহার ঝঞ্ঝাট তদপেক্ষা অনেক বেশি। বিরোধ মাত্রেই চিত্তকে বধির করিয়া ফেলে। যেখানে অন্য সকলে বধির আমি সেখানে মূক।'

জুবেয়ার বলেন, 'কোনো কোনো চিত্ত নিজের জমিতে ফসল জন্মাইতে পারে না, কিন্তু জমির উপরিভাগে যে সার ঢালা থাকে সেইখান

হইতেই তাহার শস্য উঠে।'

আমাদের কথা মনে পড়ে। আজকাল আমাদের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হইতেছে সে কি যথার্থ আমাদের মনের ভিতর হইতে না ইংরাজি য়ুনিবার্সিটি গাড়ি বোঝাই করিয়া আমাদের প্রকৃতির উপরিভাগে যে সার বিছাইয়া দিয়াছে সেইখান হইতে। এ সম্বন্ধে তর্ক তুলিলে বিরোধের সৃষ্টি হইতে পারে, অতএব মূক থাকাই ভালো।

সমালোচনা সম্বন্ধে জুবেয়ারের কতকগুলি মত নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি—

'পূর্বে যাহা সুখ দেয় নাই তাহাকে সুখকর করিয়া তোলা এক-প্রকার নূতন সৃজন।' এই সৃজনশক্তি সমালোচকের।

'লেখকের মনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়াই সমালোচনার সৌন্দর্য। লেখায় বিশুদ্ধ নিয়ম রক্ষা হইয়াছে কি না তাহারই খবরদারি করা তাহার ব্যবসাগত কাজ বটে, কিন্তু সেইটেই সব চেয়ে কম দরকারি।

'অকরুণ সমালোচনায় রুচিকে পীড়িত করে এবং সকল দ্রব্যের স্বাদে বিষ মিশাইয়া দেয়।

'যেখানে সৌজন্য এবং শান্তি নাই সেখানে প্রকৃত সাহিত্যই নাই। সমালোচনার মধ্যেও দাক্ষিণ্য থাকা উচিত; না থাকিলে তাহা যথার্থ সাহিত্যশ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে না।

'ব্যাবসাদার সমালোচকরা আকাটা হীরা বা খনি হইতে তোলা সোনার ঠিক দর যাচাই করিতে পারে না। ট্যাঁকশালের চলতি টাকা-পয়সা লইয়াই তাহাদের কারবার। তাহাদের সমালোচনায় দাঁড়িপাল্লা আছে, কিন্তু নিকষ-পাথর অথবা সোনা গলাইয়া দেখিবার মুচি নাই।

'সাহিত্যের বিচারশক্তি অতি দীর্ঘকালে জন্মে এবং তাহার সম্পূর্ণ

বিকাশ অত্যন্ত বিলম্বে ঘটে।

'রুচি লইয়া সমালোচকদের উন্মত্ত উৎসাহ, তাহাদের আক্রোশ উত্তেজনা উত্তাপ হাস্যকর। বাক্য সম্বন্ধে তাহারা এমনভাবে লেখে কেবল ধর্মনীতি সম্বন্ধেই যাহা শোভা পায়। সাহিত্য মনোরাজ্যের জিনিস, তাহার সহিত মনোরাজ্যের আচার অনুসারেই চলা উচিত—রোষের উদ্দীপনা, পিত্তের দাহ সেখানে অসংগত।'

রচনাবিদ্যার সম্বন্ধে জুবেয়ারের উপদেশগুলি নিম্নে লিখিত হইল—

'অধিক ঝোঁক দিয়া বলিবার চেষ্টাতেই নবীন লেখকদের লেখা নষ্ট হয়, যেমন অধিক চড়া করিয়া গাহিতে গেলে গলা খারাপ হইয়া যায়। বেগ কণ্ঠ ক্ষমতা এবং বুদ্ধির মিতপ্রয়োগ করিতে শেখাই রচনাবিদ্যা, এবং উৎকর্ষলাভের সেই একমাত্র রাস্তা।

'সাহিত্যে মিতাচরণেই বড়ো লেখককে চেনা যায়। শৃঙ্খলা এবং অপ্রমত্ততা ব্যতীত প্রাজ্ঞতা হইতে পারে না। এবং প্রাজ্ঞতা ব্যতীত মহত্ত্ব সম্ভবপর নহে।

'ভালো করিয়া লিখিতে গেলে স্বাভাবিক অনায়াসতা এবং অভ্যস্ত আয়াসের প্রয়োজন।'

পূর্বোক্ত কথাটার তাৎপর্য এই যে, ভালো লেখকের লিখনশক্তিটা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই শক্তিটাকে বিচারের দ্বারা পদে পদে নিয়মিত করাটা অভ্যাসসাধ্য। সেই স্বাভাবিক শক্তির সঙ্গে যখন এই অভ্যস্ত শক্তির সম্মিলন হয় তখনি যথার্থ ভালো লেখা বাহির হয়। ভালো লেখক অনায়াসেই লিখিতে পারে, কিন্তু লিখিবার জন্য পদে পদে আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে।—

'প্রাচুর্যের ক্ষমতাটা লেখকের থাকা চাই, অথচ তাহা ব্যবহার করিয়া যেন সে অপরাধী না হয়। কারণ, কাগজ ধৈর্যশীল, পাঠক

ধৈর্যশীল নহে ; পাঠকের ক্ষুধা অপেক্ষা পাঠকের মুখ মরিয়া যাওয়াকেই বেশি ভয় করা উচিত।

'প্রতিভা মহৎকার্যের সূত্রপাত করে, কিন্তু পরিশ্রম তাহা সমাধা করিয়া দেয়।

'একটা ভালো বই রচনা করিতে তিনটি জিনিসের দরকার, ক্ষমতা বিদ্যা এবং নৈপুণ্য।' অর্থাৎ স্বভাব পরিশ্রম এবং অভ্যাস।

'লিখিবার সময় কল্পনা করিতে হইবে যেন বাছা বাছা কয়েকজন সুশিক্ষিত লোকের সম্মুখে উপস্থিত আছি, অথচ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছি না।' অর্থাৎ লেখা কেবল বাছা বাছা লোকের পড়িবার যোগ্য হইলে হইবে না ; তাহা জনসাধারণের উপযুক্ত হইবে অথচ বিশিষ্ট মণ্ডলীর পছন্দসই হওয়া চাই।

'ভাবকে তখনি সম্পূর্ণ বলা যায় যখন তাহা হাতের কাছে প্রস্তুত হইয়া আসে, অর্থাৎ যখন তাহাকে যেমন ইচ্ছা পৃথক করিয়া লওয়া এবং যেখানে ইচ্ছা স্থাপন করা যায়।'

অধিকাংশ লোকেরই মনে অধিকাংশ ভাব জড়িতমিশ্রিত অবস্থায় থাকে, তাহাদিগকে আকারবদ্ধ ও পৃথক করিয়া লইতে না পারিলে বিশেষ কাজে লাগানো যায় না। জুবেয়ার নিজে সর্বদাই তাঁহার ভাবগুলিকে আকার ও স্বাতন্ত্র্য দান করিয়া তাহাদের প্রত্যেকটিকে যেন ব্যবহারযোগ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার মনের প্রত্যেক ভাবের সহিত স্পষ্ট পরিচয় স্থাপন করাই তাঁহার কাজ ছিল।

'রচনাকালে আমরা যে কী বলিতে চাই তাহা ঠিকটি জানি না, যতক্ষণ না বলিয়া ফেলি। বস্তুত কথাই ভাবকে সম্পূর্ণতা এবং অস্তিত্ব দান করে।

'ভালো সাহিত্যগ্রন্থে উন্মত্ত করে না, মুগ্ধ করে।

'যাহা বিস্ময়কর তাহা একবারমাত্র বিস্মিত করে, যাহা মনোহর তাহার মনোহারিতা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে।'

লেখার স্টাইল সম্বন্ধে জুবেয়ারের অনেকগুলি বচন আছে। কিন্তু স্টাইলকে বাংলায় কী বলিব? চলিত শব্দ হইলেই ভালো হয়, আলংকারিক পরিভাষা সর্বদা ব্যবহারযোগ্য হয় না। বাংলা 'ছাঁদ' কথা স্টাইলের মোটামুটি প্রতিশব্দ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার দোষ এই যে, শুধু ছাঁদ কথাটা ব্যবহার বাংলার রীতি নহে। বলিবার ছাঁদ, লিখিবার ছাঁদ ইত্যাদি না বলিলে কথাটা সম্পূর্ণ হয় না। সংস্কৃত ভাষায় স্থলবিশেষে রীতি শব্দে স্টাইল বুঝায়। যথা, মাগধী রীতি, বৈদর্ভী রীতি, ইত্যাদি। মগধে যে বিশেষ স্টাইল প্রচলিত তাহাই মাগধী রীতি, বিদর্ভের প্রচলিত স্টাইল বৈদর্ভী রীতি। এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের লেখায় তাঁহার একটি স্বকীয় রীতিও থাকিতে পারে, য়ুরোপীয় অলংকারে সেই স্টাইলের বহুল আলোচনা দেখা যায়।

তথাপি অনুবাদ করিতে বসিলে দেখা যাইবে, রীতি অথবা ছাঁদ সর্বত্রই স্টাইলের প্রতিশব্দরূপে প্রয়োগ করিলে ভাষার প্রথা-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। একটি উদাহরণ দিই; জুবেয়ার বলিয়াছেন, স্টাইলের চালাকিতে ভুলিয়ো না, beware of tricks of style। এ স্থলে 'রীতি' অথবা 'ছাঁদ' ঠিক এ ভাবে চলে না। কিন্তু একটু ঘুরাইয়া বলিলে কাজ চালানো যায়: লেখার ছাঁদের মধ্যে যদি চালাকি থাকে তাহা দেখিয়া ভুলিয়ো না। অথবা, লিখনরীতির চাতুরীতে ভুলিয়ো না। কিন্তু যেখানে স্টাইল কথাটা ব্যবহার করিলে সুবিধা পাওয়া যাইবে সেখানে আমরা প্রতিশব্দ বসাইবার চেষ্টা করিব না।—

'ডুসোল্ট্ বলেন, মনের অভ্যাস হইতে স্টাইলের উৎপত্তি। কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতির অভ্যাস হইতে যাহাদের স্টাইল গঠিত তাহারাই ধন্য।'

অনুবাদে আমরা সাহস করিয়া 'প্রকৃতি' শব্দটা ব্যবহার করিয়াছি। মূলে যে কথা আছে তাহার ইংরাজি প্রতিশব্দ 'soul'। এস্থলে 'আত্মা' কথা বলা যায় না, তাহার দার্শনিক অর্থ অন্য প্রকার। এখানে 'সোল্'

শব্দের অর্থ এই যে, তাহা মনের ন্যায় আংশিক নহে। মন তাহার অধীন। মন হৃদয় ও চরিত্র তাহার অঙ্গ— এই 'সোল্' শব্দে মানসিক সমগ্রতা প্রকাশ হইতেছে। 'অন্তঃপ্রকৃতি' শব্দ-দ্বারা যদি এই অখণ্ড মানসতন্ত্রের ঐক্যটি না বুঝায় তবে পাঠকেরা উপযুক্ত শব্দ ভাবিয়া লইবেন। জুবেয়ারের কথাটার তাৎপর্য এই যে, মন তো চিন্তার যন্ত্র, তাহার চালনা-দ্বারা কৌশল শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ মানুষটির দ্বারা যে স্টাইল গঠিত হয় তাহাই স্টাইল বটে। সেই লিখনরীতির মধ্যে কেবল চিন্তার প্রভাব নহে, সমস্ত মানুষের একটি সম্পূর্ণ প্রভাব পাওয়া যায়।

'মনের অভ্যাস হইতে নৈপুণ্য, প্রকৃতির অভ্যাস হইতে উৎকর্ষ এবং সম্পূর্ণতা।'

ভালো লেখকমাত্রেরই একটি স্বকীয় লিখনরীতি থাকে, কিন্তু বড়ো লেখকের সেই রীতিটি পরিষ্কার ধরা শক্ত। তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ অনির্দিষ্টতা থাকে। এ সম্বন্ধে জুবেয়ার লিখিতেছেন, 'যাহাদের ভাবনা ভাষাকে ছাড়াইয়া যায় না, যাহাদের দৃষ্টি ভাবনাকে অতিক্রম করে না, তাহাদের লিখনরীতি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট হইয়া থাকে।'

মহৎ লেখকদের ভাষা অপেক্ষা ভাবনা বড়ো হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের মানসদৃষ্টি ভাবনাকেও অতিক্রম করিয়া যায়। তাঁহারা যুক্তি-তর্ক-চিন্তাকে লঙ্ঘন করিয়া অনেক জিনিস সহজে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহাদের রীতি বাঁধাছাঁদা কাটাছাঁটা নহে, 'তাহার মধ্যে একটি অনির্দেশ্যতা অনির্বচনীয়তা থাকিয়া যায়।

'সুকথিত রচনার লক্ষণ এই যে, ঠিক যেটুকু আবশ্যক তার চেয়ে সে অধিক বলে, অথচ যেটি বলিবার নিতান্ত সেইটিই বলে; ভালো লেখায় একই কালে প্রচুর এবং পরিমিত, ছোটো এবং বড়ো মিশ্রিত থাকে। এক কথায় ইহার শব্দ সংক্ষিপ্ত, অর্থ অসীম।

'অতিমাত্রায় ঠিকঠাকের ভাবটা ভালো নয়, কী সাহিত্যে কী আচরণে শ্রী রক্ষা করিয়া চলিতে গেলে এই নিয়ম স্মরণ রাখা আবশ্যক।

'কোনো-কোনো রচনারীতির একপ্রকার পরিষ্কার খোলাখুলি ভাব আছে, লেখকের মেজাজ হইতে তাহার জন্ম। সেটা আমাদের ভালো লাগিতে পারে, কিন্তু সেটা চাইই চাই এমন কথা বলা যায় না।··· ভল্টেয়ারের লেখার এই গুণ, কিন্তু পুরাতন লেখকদের রচনায় ইহা দেখা যায় না। অতুলনীয় গ্রীক্ সাহিত্যের স্টাইলে সত্য সুষমা এবং সৌহার্দ্য ছিল, কিন্তু এই খোলাখুলি ভাবটা ছিল না। সৌন্দর্যের কতকগুলি মুখ্য উপাদানের সঙ্গে এই গুণটি ঠিক মিশে না। প্রবলতার সঙ্গে ইহা খাপ খাইতে পারে, কিন্তু মর্যাদার সঙ্গে নহে। এই গুণটির মধ্যে একপ্রকার সাহসিকতা ও স্পর্ধা আছে বটে, কিন্তু তেমনি ইহার মধ্যে একটা খাপ-ছাড়া খিট্‌খিটে ভাবও আছে।

'যাহারা অর্ধেক বুঝিয়াই সন্তুষ্ট হয় তাহারা অর্ধেক প্রকাশ করিয়াই খুশি থাকে ; এমনি করিয়াই দ্রুত রচনার উৎপত্তি।

'নবীন লেখকেরা মনটাকে টহলায় বেশি, কিন্তু খোরাক অতি অল্পই দেয়।

'কাচ যেমন, হয় দৃষ্টিকে সাহায্য করে নয় ঝাপ্‌সা করিয়া দেয়, কথা জিনিসটিও তেমনি।

'এক প্রকারের কেতাবি স্টাইল আছে যাহার মধ্যে কাগজেরই গন্ধ পাওয়া যায়, বিশ্বসংসারের গন্ধ নাই ; পদার্থের তত্ত্ব যাহার মধ্যে দুর্লভ আছে কেবল লেখকিআনা।'

বই জিনিসটা ভাব-প্রকাশ ও রক্ষার একটা আধারমাত্র। কিন্তু অনেক সময় সে'ই নিজে সর্বেসর্বা হইয়া উঠে। তখন সে বই পড়িয়া মনে হয় এ কেবল বই পড়িতেছি মাত্র, এগুলা কেবল লেখা। ভালো বই পড়িবার সময় মনে থাকে না বই পড়িতেছি ; ভাব এবং তত্ত্বের

সহিত মুখামুখি পরিচয় হয়, মধ্যস্থ পদার্থটা চোখেই পড়ে না—

'অনেক লেখক আপনার স্টাইলটাকে ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজাইতে থাকে, লোককে জানাইতে চায় তাহার কাছে সোনা আছে বটে।

'দুর্লভ আশাতীত স্টাইল ভালো, যদি জোটে। কিন্তু আমি পছন্দ করি, যে স্টাইলটিকে ঠিক প্রত্যাশা করা যায়।'

—এ কথাটির মধ্যে গভীরতা আছে। অভাবনীয় আশাতিরিক্ত সৌন্দর্যকে ভালো বলিতেই হইবে; তথাপি তাহা মনের ভারস্বরূপ, তাহাতে শ্রান্তি আনে। কিন্তু যেখানে যেটি আশা করা যায় ঠিক সেইটি পাইলেই মন শান্তি ও স্বাস্থ্য অনুভব করে, তাহাকে বিস্ময় বা সুখের ধাক্কায় বারম্বার আহত করিয়া ক্ষুব্ধ করে না। বাংলায় যে বচন আছে 'সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো' তাহারও এই অর্থ। স্বস্তির মধ্যে যে শান্তি ও গভীরতা, ব্যাপ্তি ও ধ্রুবত্ব আছে, সুখের মধ্যে তাহা নাই। এইজন্য বলা যাইতে পারে সুখ ভালো বটে, কিন্তু স্বস্তি তাহার চেয়েও প্রার্থনীয়।

বৈশাখ ১৩০৮

ডি প্রোফণ্ডিস

টেনিসন এই কবিতাটিকে The Two Greetings কহিয়াছেন। অর্থাৎ ইহাতে তাঁহার সন্তানটিকে দুইভাবে তিনি সম্ভাষণ করিয়াছেন। প্রথমত তাঁহার নিজের সন্তান বলিয়া, দ্বিতীয়ত তাঁহার আপনাকে তফাত করিয়া। এক তাহার মর্তজীবন ধরিয়া, আর-এক তাহার চিরন্তন সত্তা ধরিয়া। একটিতে তাহাকে আংশিকভাবে দেখিয়া, আর-একটিতে তাহাকে সর্বতোভাবে দেখিয়া। তাঁহার সন্তানের মধ্যে তিনি দুই ভাগ দেখিতে পাইয়াছেন ; একটি ভাগকে তিনি স্নেহ করেন, আর-একটি ভাগকে তিনি ভক্তি করেন। প্রথম সম্ভাষণ স্নেহের সম্ভাষণ, দ্বিতীয় সম্ভাষণ ভক্তির।

প্রথম ভাগ। প্রথম, শিশু জন্মিতেই তিনি ভাবিলেন এ কোথা হইতে আসিল। বৈদিক ঋষিকবিরা মহা অন্ধকারের রাজ্য হইতে, দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্রগর্ভ হইতে তরুণ সূর্যকে উঠিতে দেখিয়া যেমন সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেন 'এ কোথা হইতে আসিল', তেমনি সসম্ভ্রমে কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কোথা হইতে আসিল'। তিনি দেখিলেন, এই শিশুটি যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই পৃথিবীরই সহোদর। মহাসৌরজগতের যমজ ভ্রাতা। তিনি তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, 'বৎস আমার, সেই মহাসমুদ্র, যেখানে যাহা-কিছু-ছিল'র মধ্যে যাহা-কিছু-হইবে— অর্থাৎ অতীতের মধ্যে ভবিষ্যৎ— কোটি-কোটি যুগ যুগান্তর ধরিয়া অগণ্য আবর্তমান জ্যোতিঃপুঞ্জের মহামরুর মধ্যে ঘূর্ণমান হইতেছিল, তুমি সেইখান হইতে আসিতেছ।' সেইখান হইতেই সূর্য আসিয়াছে, পৃথিবী ও চন্দ্র আসিয়াছে এবং তাহার অন্যান্য গ্রহ-সহোদরগণ আসিয়াছে। অতীতের সেই উষাগর্ভে কবি প্রবেশ করিয়া দেখিলেন অপরিস্ফুট পৃথিবীর কারণপুঞ্জ যেখানে আবর্তিত হইতেছে

আজিকার সদ্যোজাত শিশুটির কারণপুঞ্জ সেইখানে ঘুরিতেছে। উভয়ের বয়স এক; কেবল একজন ত্বরায় আমাদের চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে আর-একজন প্রকাশিত হইতে বিলম্ব করিয়াছে।

Out of the deep, my child, out of the deep,
Where all that was to be, in all that was,
Whirl'd for a million æons thro' the vast
Waste dawn of multitudinous eddying light—
Out of the deep, my child, out of the deep,
Thro' all this changing world of changeless law,
And every phase of ever-heightening life,
And nine long months of antenatal gloom,
With this last moon, this crescent— her dark orb
Touched with earth's light— thou comest, darling boy.

অতীতের কথা শেষ হইয়াছে, এখন বর্তমানের কথা আসিতেছে। কবি শিশুটির পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, অতীতকাল যাহাকে এত যত্নে লালন পালন করিয়া আসিতেছে, সে কে। সে তাঁহারই প্রাণাধিক পুত্র। তাঁহারই পুত্রকে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার সঙ্গে অতীতমাতা এক গর্ভে ধারণ করিয়াছে, এক জ্যোতির্ময় দোলায় দোলাইয়াছে, এক স্তন পান করাইয়া পুষ্ট করিয়াছে, আজ তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিল। তাঁহার আজিকার এই প্রাণাধিক বৎস প্রকৃতির এতদিনকার যত্নের ধন। তাহাকে কহিলেন, 'তুই আমাদের আপনার ধন। তোর সর্বাংশসুন্দর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গঠন ভাবী সর্বাঙ্গসুন্দর বয়স্ক পুরুষের ভবিষ্যৎ সূচনা করিতেছে। আমার স্ত্রীর ও আমার মুখ ও গঠন তোর মুখের ও গঠনের মধ্যে অচ্ছেদ্যবন্ধনে বিবাহিত হইয়াছে।' কবি দেখিলেন, যে অনাদি অতীতের ধন সে আজ নিতান্তই তাঁহাদের।

অবশেষে তাহার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ও কহিলেন—

Live, and be happy, in thyself, and serve
This mortal race thy kin so well, that men
May bless thee as we bless thee, O young life,
Breaking with laughter from the dark ; and may
The fated channel where thy motion lives
Be prosperously shaped, and sway thy course
Along the years of haste and random youth
Unshattered ; then full current thro' full man ;
And last in kindly curves, with gentlest fall,
By quiet fields, a slowly dying power,
To that last deep where we and thou are still.

এখন আর সে নিতান্তই তাঁহাদের নহে। এখন তাহার নিজত্ব বিকশিত হইয়াছে। এখন তাহার নিজের কাজ আছে। কবি তাহার মর্তজীবনের তিনটি অবস্থা সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমে মর্তজীবনের আদিকারণ আলোচনা করিলেন, পরে তাহার জন্ম অর্থাৎ মনুষ্যশরীরধারণ আলোচনা করিলেন ও পরে তাহার পার্থিব জীবন আলোচনা করিলেন। এইখানেই সমস্ত ফুরাইল। প্রথম সম্ভাষণ শেষ হইল। এই সম্ভাষণে কবি একটি মর্তের মানুষকে সম্ভাষণ করিয়াছেন। যতক্ষণ সে মনুষ্য ততক্ষণ সে তাঁহার। তাঁহাকে সমর্পণ করিবার জন্যই অতীত ইহাকে গড়িয়াছে। গঠিত অবস্থায় দেখিলেন সে তাঁহারই মতো।

যাহা হউক, এইখানেই সমস্ত শেষ হইয়া যায় ; জীবন আরম্ভ হইল, জীবন শেষও হইল। তখন জীবনের সমাপ্তির উপর কবি দাঁড়াইয়া দূর-দূরান্তরে দৃষ্টি চালনা করিলেন। দেখিলেন, জীবন শেষ হইল, তাঁহার সন্তান শেষ হইল, কিন্তু যে সূত্র বাহিয়া এই সন্তান আসিয়াছে সেই

স্বপ্নের শেষ হইল না। তিনি এখন দেখিলেন, অনন্ত পথের একজন পথিক, পথের মধ্যে অবস্থিত তাঁহার গৃহে পৃথিবীতলে অতিথি হইয়াছে। এই আতিথ্যজীবনকে সন্তান বলে, মনুষ্য বলে। আতিথ্যজীবন ফুরায়, সন্তানও ফুরায়, কিন্তু পথিক ফুরায় না। প্রথমে তিনি সেই অতিথিকে সম্ভাষণ করিলেন, এখন সেই মহাপান্থকে সম্ভাষণ করিতেছেন। এখন পৃথিবীর অতিথিকে নহে, মহাকালের অতিথিকে সম্ভাষণ করিলেন। এখন তিনি দেখিতেছেন যে, এই পথিক সৌরজগতেরও জ্যেষ্ঠভ্রাতা। প্রথম সম্ভাষণে তিনি কোটি কোটি যুগ ও আবর্তমান আলোকের নির্মাণশালার উল্লেখ করিয়াছেন, অপরিবর্তনীয় পরিবর্তনের জগতে ক্রমোত্থানশীল জীবনের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন—

With this last moon, this crescent— her dark orb
Touched with earth's light— thou comest

অর্থাৎ মনুষ্যের জন্মও এইরূপ চন্দ্রকলার ন্যায়; তাহার একাংশ পৃথিবীর জীবন, পৃথিবীর বুদ্ধি পাইয়া আলোকিত হয়। দ্বিতীয় ভাগে যাহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন তাহার কারণ আলোচনা করিতে গিয়া কবি সময়ের সংখ্যা গণনা করেন নাই, নির্মাণের উপাদান উল্লেখ করেন নাই। এইবার তিনি কহিতেছেন—

Out of the deep, my child, out of the deep,
From that great deep, before our world begins,
Whereon the Spirit of God moves as He will—
Out of the deep, my child, out of the deep,
From that true world within the world we see,
Whereof our world is but the bounding shore—
Out of the deep, my child, out of the deep,
With this ninth moon, that sends the hidden sun

Down yon dark sea, thou comest, darling boy.

এবার কবি যে সমুদ্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আলোকের সমুদ্র নহে, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের দিকে তাহার উপকূল নাই, তাহা তিন কাল মগ্ন করিয়া বিরাজ করিতেছে। জগতের আত্মাকে তিনি উল্লেখ করিতেছেন। জগতের অন্তরস্থিত যথার্থ জগতের কথা বলিতেছেন। বাহ্যজগতে সেই অন্তর্জগৎকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে মাত্র।

Out of the deep, spirit, out of the deep,
With this ninth moon, that sends the hidden sun
Down yon dark sea, thou comest, darling boy.

সেই সমুদ্র হইতে তুমি আসিতেছ। জ্যোতির্ময় স্বর্যকে সমুদ্রতলে বিসর্জন দিয়া ক্ষীণালোকে চন্দ্র উদিত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও উদিত হইলে, তুমি মহাজ্যোতিকে বিসর্জন করিয়া আসিলে।

পূর্বে যে মনুষ্যকে কবি সম্ভাষণ করিয়াছিলেন সে অপরিস্ফুটতার অবস্থা হইতে পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এবারে যে আত্মাকে সম্ভাষণ করিতেছেন সে পূর্ণ অবস্থা হইতে অপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

For in the world, which is not ours, They said
'Let us make man' and that which should be man,
From that one light no man can look upon,
Drew to this shore lit by suns and moons
And all the shadows.

'সে জগৎ আমাদের নহে।' সে কোন্ জগৎ? কে জানে কোন্ জগৎ! মহাকবি আদিকবির মনোজগৎ কি? They said— তাহারা কহিল। কাহারা? কে জানে কাহারা! কবি আলোকের রাজ্যে অন্ধ, এই নিমিত্ত তাঁহার কথা অস্পষ্ট। তিনি কহিতেছেন, 'যে জগৎ আমাদের নহে, সেই জগতে তাহারা কহিল: আইস, আমরা মনুষ্য হই।' ভাবী মনুষ্য মনুষ্যচক্ষুর

অসংখ্যনীয় সেই এক-আলোক হইতে এই ছায়ালোকিত উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। one light— এক পরমজ্যোতি হইতে তাহারা আসিতেছে। সেই জ্যোতির তাহারা অংশ।

O dear spirit half-lost
In thine own shadow and this fleshly sign
That thou art thou— who wailest being born
And banished into mystery, and the pain
Of this divisible indivisible world,
Among the numerable-innumerable
Sun, sun, and sun, thro' finite-infinite space
In finite-infinite Time— our mortal veil
And shattered phantom of that infinite one,
Who made thee unconceivably Thyself
Out of this World-self and all in all—
Live thou

হে আত্মা, তুমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছ! তুমি কী হইতে কী হইয়াছ! তুমি যে জগতে আসিয়াছ তাহাকে ভাগ করিয়া শেষ করা যায়। তখন যে এক-জগতে ছিলে তাহা গণনার জগৎ নহে। এখন যে জগতে আসিয়াছ, এখানে সূর্য নক্ষত্র গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, তথাপি গণনা করা যায়। তখন অসীম দেশে অসীম কালে ছিলে। এখন যে দেশে যে কালে নির্বাসিত হইয়াছ তাহার সীমা পাইতেছি না, অথচ সীমা আছে। তাহা সীমা-বিভক্ত অসীম।

কিন্তু এইখানেই তোমার শেষ নহে। তুমি অসীমের নিকট হইতে অসীম দূরে আসিয়াছ; তুমি অনন্তকাল ধরিয়া ক্রমশ তাঁহার নিকটবর্তী হইতে থাকিবে। তোমাকে আর কী কহিব—

Live thou ; and of the grain and husk, the grape
And ivyberry, choose ; and still depart
From death to death thro' life and life find
Nearer and ever nearer Him who wrought
Not matter, nor the finite-infinite,
But this main miracle that thou art thou,
With power on thine own act and on the world.

প্রথম সম্ভাষণে মনুষ্যভাবে তোমাকে কহিয়াছিলাম—

Live, and be happy in thyself, and serve
This mortal race thy kin.

বাঁচিয়া থাকো ; তুমি সুখী হও, তোমার স্বজাতীয় জীবদিগকে সুখী করো ও অবশেষে বিনা কষ্টে ধীরে ধীরে মৃত্যু লাভ করো। মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কী আশীর্বাদ আছে ? কিন্তু দ্বিতীয় সম্ভাষণে তোমাকে কহিতেছি 'বাঁচিয়া থাকো'। এখানে বাঁচিয়া থাকার অর্থ অমরতা। জন্মে জন্মে যাহা ভালো তাহাই গ্রহণ করো, যাহা মন্দ তাহাই পরিত্যাগ করো ও পদে পদে মৃত্যুর দ্বারসমূহ অতিক্রম করিয়া অমৃতের দিকে ধাবমান হও। দুইটি সম্ভাষণে দুই প্রকারের বিভিন্ন আশীর্বাদ কেন করিলাম ? না, প্রথমবারে আমি বস্তু (matter) ও সসীম-অসীমকে সম্বোধন করিয়াছিলাম। দ্বিতীয়বারে আমি তোকে সম্ভাষণ করিতেছি who art 'not matter, nor the finite-infinite but this main-miracle, that thou art thou, with power on thine own act and on the world'

সন্তানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কবি এক অনন্ত রাজ্যের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই অনন্তমন্দিরে গিয়া তিনি কাহাকে দেখিতে পাইলেন ? কী গান গাহিয়া উঠিলেন ?—

Hallowed be Thy name— Hallelujah—
Infinite Ideality !
Immeasurable Reality :
Infinite Personality :
Hallowed be Thy name— Hallelujah ;
We feel, we are nothing—for all is Thou and in Thee :
We feel we are something— that also has come from Thee :
We know we are nothing— But Thou wilt help us to be.
Hallowed be Thy name— Hallelujah

অনন্ত ভাব। অপরিমেয় সত্য। অপরিসীম পুরুষ। অনন্ত ভাব আমাদের হইতে অত্যন্ত দূরবর্তী। কিছুতেই তাহার কাছে যাইতে পারি না। অবশেষে সেই ভাবমাত্রকে যখন সত্য বলিয়া জানিলাম তখন তিনি আমাদের আরো কাছে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কেবলমাত্র সত্য বলিয়া জানিয়া তৃপ্তি হয় না। যখন জানিলাম তিনি অসীম পুরুষ তখন তিনি আমাদের কাছে আসিলেন, তখন তাঁহাকে আমরা প্রীতি করিতে পারিলাম। তখন তাঁহাকে কহিলাম, তোমার জয় হউক।

We feel we are nothing— for all is Thou and in Thee : ইহা অতীতের কথা। যখন আমরা তোমার মধ্যে ছিলাম তখন সকলই তুমি। ইহাই আমাদের ভাব মাত্র। তোমার মধ্যে আমরা ভাব মাত্রে ছিলাম। অবশেষে তোমার কাছ হইতে যখন আসিলাম তখন অনুভব করিতে লাগিলাম, আমরা কিছু : We feel we are something that also has come from Thee। ইহা বর্তমানের কথা, ইহাই আমাদের সত্য। এখন আমরা কিছু হইয়াছি, আমরা সত্য হইয়াছি। We know we are nothing— but Thou wilt help us to be : ইহাই ভবিষ্যতের কথা। আমরা জানি আমরা কিছুই নই—

তুমি আমাদের ক্রমশই গঠিত করিয়া তুলিতেছ, আমাদের ব্যক্ত করিয়া তুলিতেছ। মৃত্যুর মধ্য দিয়া নূতন নূতন সত্য, নূতন নূতন জ্ঞান শিখাইয়া আমাদের পূর্ণ ব্যক্তি করিয়া তুলিতেছ। কোনো কালেই তাহা হইতে পারিব না, চিরকালই Thou wilt help us to be। অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার আনন্দ আমরা চিরকাল ভোগ করিব। তোমার জয় হউক। মর্তজীবনেও এই ক্রমোন্নতির তুলনা মিলে। মনুষ্য প্রথমে এক মহাবাষ্পরাশির মধ্যে, সমস্ত জগতের আদিভূতের মধ্যে মিলিয়া ছিল। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে পৃথক হইয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিল। অবশেষে যতই সে বড়ো হইতে লাগিল, অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিল, ততই তাহার ব্যক্তিত্ব জন্মিতে লাগিল। এই ক্রম অনুসারেই কবি ঈশ্বরকে প্রথমে অনন্ত ভাব, পরে অপরিমেয় সত্য ও তৎপরে অপরিসীম পুরুষ বলিয়াছেন। এইখানে কবিতা শেষ হইল।

আশ্বিন ১২৮৮

—

'আধুনিক সাহিত্য' ১৩১৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে সন্নিবেশের ক্রম অনুসরণ পূর্বক, প্রবন্ধগুলির সাময়িকপত্রে প্রকাশের সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১	বঙ্কিমচন্দ্র	সাধনা	১৩০১ বৈশাখ
২	বিহারীলাল	সাধনা	১৩০১ আষাঢ়
৩	সঞ্জীবচন্দ্র	সাধনা	১৩০১ পৌষ
৪	বিদ্যাপতির রাধিকা	সাধনা	১২৯৮ চৈত্র
৫	কৃষ্ণচরিত্র	সাধনা	১৩০১ মাঘ, ফাল্গুন
৬	রাজসিংহ	সাধনা	১৩০০ চৈত্র
৭	ফুলজানি	সাধনা	১৩০১ অগ্রহায়ণ
৮	যুগান্তর	সাধনা	১৩০১ চৈত্র
৯	আর্যগাথা	সাধনা	১৩০১ অগ্রহায়ণ
১০	আষাঢ়ে	ভারতী	১৩০৫ অগ্রহায়ণ
১১	মন্দ্র	বঙ্গদর্শন	১৩০৯ কার্তিক
১২	শুভবিবাহ	বঙ্গদর্শন	১৩১৩ আষাঢ়
১৩	মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস	ভারতী	১৩০৫ শ্রাবণ
১৪	সাকার ও নিরাকার	ভারতী	১৩০৫ আশ্বিন
১৫	জুবেয়ার	বঙ্গদর্শন	১৩০৮ বৈশাখ
১৬	ডি প্রোফণ্ডিস	ভারতী	১২৮৮ আশ্বিন

উল্লিখিত তালিকার প্রথম প্রবন্ধটি 'চৈতন্য লাইব্রেরি'র এক বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হয়; সাধনায় যে আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সূচনা এবং অন্য বহু অংশ ত্যাগ করিয়া গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে— পরিত্যক্ত অংশগুলি সাধনায় বা নবমখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে দ্রষ্টব্য। ষষ্ঠ প্রবন্ধ 'রাজসিংহ' সাধনায় যেরূপ প্রকাশিত হয় তাহার

সূচনার বহুলাংশ ত্যাগ করিয়া গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে ; সাধনা অথবা নবমখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য। পঞ্চদশ প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' রূপে 'রচনা সম্বন্ধে জুবেয়ারের বচন' এই শিরোনামে মুদ্রিত হয়।

'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে আলোচিত অধিকাংশ লেখকই বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ ; সমালোচিত গ্রন্থগুলিও প্রায়শঃই বহুখ্যাত। কয়েক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থকারদের নাম সংক্ষেপে দিয়াছেন, কয়েক ক্ষেত্রে নাম দেওয়া হয় নাই, অথচ হয়তো আধুনিক পাঠকের পক্ষে ইঙ্গিতই যথেষ্ট নয়, সেজন্য পরবর্তী উল্লেখগুলির প্রয়োজন হইতে পারে—

'ফুলজানি' শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের রচিত ; 'যুগান্তর' গ্রন্থের রচয়িতা শিবনাথ শাস্ত্রী ; 'আর্য্যগাথা' 'আষাঢ়ে' 'মন্দ্র' তিনখানি কাব্যেরই লেখক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ; 'শুভবিবাহ' গ্রন্থের লেখিকা শরৎকুমারী চৌধুরানী। 'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' এবং 'সাকার ও নিরাকার' প্রবন্ধদ্বয়ের সূচনায় প্রয়োজনীয় উল্লেখ আছে।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'ফুলজানি' সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে তাঁহার রচনারীতি সম্পর্কে এই গ্রন্থের সপ্তম নিবন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে তাহারই পরিপূরক হিসাবে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের কয়েকটি অংশ সংকলন করা যাইতে পারে—

... আপনার বহিটা শেষ হয়ে গেলে সাধারণ পাঠকদের কিরকম লাগে জানতে ইচ্ছে রইল। হয়তো বা ভালো লাগতেও পারে। ভালো লাগবার একটা কারণ এই দেখছি, আপনি আপনার কেতাবের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত বাংলাদেশের একটি সজীব মূর্তি জাগ্রত

করে তুলেছেন, বাংলার আর-কোনো লেখক এতে কৃতকার্য হন নি। এখনকার অধিকাংশ বাংলা বই প'ড়ে আমার এই মনে হয় যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সময় বাংলাদেশই ছিল কি না ভবিষ্যতে এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে।··· ভবিষ্যতে এমন একজন তত্ত্বজ্ঞের প্রাদুর্ভাব হতে পারে যিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিতে পারবেন যে, বাংলা সাহিত্য যে দেশের সাহিত্য সে দেশ মূলেই ছিল না— তখন বঙ্কিমবাবুর এত সাধের 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং' পুরাতত্ত্বের গবেষণার তোড়ে কোথায় ভেসে যাবে। পণ্ডিতেরা বলবেন, বঙ্গসাহিত্য একটা কলেজের সাহিত্য, এটা দশের সাহিত্য নয়— কিন্তু সে কলেজটা ছিল কোথায় এ বিষয়ে কিছুই মীমাংসা হবে না। আপনার সেই লেখাটির মধ্যে বাংলাদেশের সন্ধান পাওয়া যায়।··· ৩০ এপ্রেল ১৮৮৬

বলা বাহুল্য পত্রখানি শ্রীশবাবুর উদ্দেশে লিখিত। শ্রীশবাবুকে লেখা (ছিন্নপত্র গ্রন্থে সংকলিত) পরবর্তী আর-একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

··· শীতল ছায়া, আম-কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা, এরই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে, তরল কলধ্বনি তুলে, বিরহমিলন হাসিকান্না নিয়ে যে মানবজীবনস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন। প্রকৃতির শান্তির মধ্যে, স্নিগ্ধচ্ছায়াশ্যামল নীড়ের মধ্যে যেসব ছোটো ছোটো হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাস করছে, দোয়েল কোকিল বউকথাকও'এর গানের সঙ্গে মানবহৃদয়ের যেসকল আকাঙ্ক্ষাধ্বনি মিশ্রিত হয়ে অবিশ্রাম আকাশের দিকে উঠছে, আপনার লেখার মধ্যে সেই ছবি এবং সেই গান মেশাবেন।··· বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্ত বাঙালিদের সুখদুঃখের কথা এপর্যন্ত কেহই বলেন নি··· বঙ্কিমবাবু ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালির কথা যেখানে বলেছেন সেখানে কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু

যেখানে পুরাতন বাঙালির কথা বলতে গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে ; চন্দ্রশেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড়ো বড়ো মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল-দেশীয় সকল-জাতীয় লোকই হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতি এবং দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালি আঁকতে পারেন নি। আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্ত-বাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভালো করে বলে নি। ১৮৮৮

—